অ্যাকশন সিরিজ

কমান্ডো

রকিব হাসান

ক্যাথার্সিস পাবলিশিং

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

আপনাদের প্রিয় ওয়েবসাইট Banglapdf.net এখন ডোমেইন নেইম পরিবর্তন করে BanglaPdfBoi.Com এ রুপান্তরিত হয়েছে। আপনারা সবাই নিজ নিজ বুকমার্কস পরিবর্তন করে নিবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

কমান্ডো

ইউসুফ পাশা, দুর্ধর্ষ এক বাংলাদেশী যুবক।
জন্ম আমেরিকায়, লেখাপড়াও সেখানেই।
সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল প্রথমে,
সেখান থেকে আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিসে।
সারা দুনিয়ার সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
ঘোষণা করেছে ও।
বিপজ্জনক মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশে
দেশে।
মৃত্যুর পরোয়া করে না।
অ্যাডভেঞ্চার! অ্যাকশন! রহস্যভেদ!
সবই রয়েছে এতে।

নতুন ধরনের এই অ্যাকশন সিরিজে
পাঠককে স্বাগতম।

এক

বিশ নট গতিতে এগিয়ে চলেছে কোস্টগার্ডের পেট্রোল বোট সিজি ৪০৪০১। রুটিন পেট্রোলে বেরিয়েছে অ্যালমেডা কোস্টগার্ড বেসের সদস্যরা। এদের প্রায় সবাই টগবগে তরুণ। বোটের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট ক্রিস্টোফার পাইকের বয়েসও তেমন বেশি নয়। কোন তাড়াহুড়াও নেই। নতুন এই বোটটা চালিয়ে পরীক্ষা করে দেখার জন্য সারাটা রাতই সামনে পড়ে আছে। কোন সমস্যা দেখা দিলে সকালে বেস-এ ফিরে রিপোর্ট করলেই চলবে।

উত্তরে বিছিয়ে থাকা কালির মত কালো পানির দিকে তাকিয়ে আছে পাইক। চাঁদহীন, মেঘে ঢাকা কালো আকাশের নিচে প্রশান্ত মহাসাগরকে দেখাচ্ছে একটা সীমাহীন কালো মখমলের চাদরের মত।

মোরগের মত ঘাড় ঘুরিয়ে পাশে দাঁড়ানো অস্থির তরুণের দিকে তাকালেন তিনি। 'শান্ত হও, প্রিক। কোনরকম বিপদের সম্ভাবনা দেখছি না আমি। অন্তত আমাদের এই শিফটে তো নয়ই।'

অ্যাকাডেমি থেকে সদ্য বেরিয়েছে এনসাইন প্রিক জনসন। অফিসার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে অ্যালামেডায়। আজকের পেট্রোলটা ওর প্রথম পেট্রোল। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু ড্রাগ স্মাগলারদের ব্যাপারটা কী হবে, সার? শুনেছি, সব সময়ই নাকি এ জায়গাটায় ওদের সঙ্গে কোস্ট পেট্রোলের সংঘর্ষ বাঁধে।'

'বেশি বেশি শুনেছ। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে যে ওদের সঙ্গে দেখা হয় না, তা বলব না; তবে প্রতি রাতেই ওদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ হওয়ার কথাটা একেবারেই গুজব। স্মাগলাররা বোকা নয়, এনসাইন। ওরা জানে, আমাদের বোটটা খুব দ্রুত চলতে পারে। তা ছাড়া আমাদের কাছে রয়েছে অত্যন্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি, যেগুলোর সাহায্যে যে কোন বোটকে শনাক্ত করে ফেলা সম্ভব।'

যেন এই কথাটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ঠিক এ সময় পাইপের ভিতর দিয়ে কথা বলে উঠল সোনার অপারেটর, 'লেফটেন্যান্ট, সামনে ডানদিকে একটা টার্গেট শনাক্ত করেছি।'

তীরের দিকের কালো পানিতে নজর বোলালেন লেফটেন্যান্ট। কিন্তু কোন আলো চোখে পড়ল না। 'রেঞ্জ আর অবস্থান জানাও, সিম্যান।'

'রেঞ্জ ওয়ান-জিরো-নাইন-জিরো। এখন ওটা নড়ছে না, সার। কিন্তু...'

সোনারম্যানের এই অনিশ্চয়তা অস্বাভাবিক লাগল লেফটেন্যান্টের

কাছে। সিম্যান রবার্ট স্টাইনের দক্ষতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই তাঁর। জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু কী?'

'না, সার, প্রথমবার যে সঙ্কেতটা দিল, সেটা যন্ত্রের গোলমালও হতে পারে। কারণ পানির সমতলের ঠিক নীচে থেকে এসেছিল সঙ্কেত। এখন পানির ওপরে।'

কী করবেন ভাবছেন পাইক। রুটিন টহল চালিয়ে যাবেন, নাকি জিনিসটা কী দেখতে যাবেন? সানফ্র্যান্সিসকো থেকে আসা মাছধরা বোট কিংবা ইয়ট বলে মনে হলো না। জনসনের কৌতূহলী দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন, দেখতে যাবেন। হয়তো কিছুই না, কিন্তু ওকে শান্ত করতে পারবেন।

'হ্যাঁ, ওদিকে যেতে বলো,' নির্দেশ দিলেন তিনি। 'সবাইকে ডিউটি স্টেশনে হাজির থাকতে বলো। আর সমস্ত আলো নিভিয়ে দিতে বলো।'

ব্যস্ততা শুরু হলো জাহাজে। পুরো ব্রিজটা অন্ধকার হয়ে গেল, শুধু ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের লাল-সবুজ আলোগুলো বাদে।

আবার রিপোর্ট করল স্টাইন। 'রেঞ্জ এক হাজার গজ, স্যার। টার্গেট এখনও আগের জায়গাতেই আছে। তিনশো ফুট গভীর একটা খাঁড়িতে।'

'আকৃতি?' পাইক জিজ্ঞেস করল।

'খুব সরু, সার। আশি ফুট লম্বা। টুইন প্রপেলার।'

'সার, দেখুন,' বলে উঠল প্রিক। হাত তুলে গলুইয়ের ওপর দিয়ে দেখাল।

দ্রুত হয়ে গেল লেফটেন্যান্টের নাড়ির গতি। তীরের ঢিবির মত উঁচু হয়ে থাকা একটা জায়গা থেকে তিনবার জ্বলল একটা আলো।

জবাব গেল পানিতে ভাসমান জলযান থেকে।
'সিগন্যাল দিচ্ছে!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল প্রিক।
রবার্ট স্টাইনের কথা শোনা গেল, 'টার্গেট নড়তে শুরু করেছে, সার। এক নটেরও কম গতিতে। তীরের দিকে এগোচ্ছে।'
শিরশির করে উঠল পাইকের মেরুদণ্ড। কনসোল থেকে একটা নাইট-ভিজন স্কোপ নিয়ে অন্ধকার তীরভূমির দিকে তাকালেন তিনি। পেট্রোল বোটটা এখনও অনেক দূরে রয়েছে, ভালমত বোঝা যাচ্ছে না কিছু। তবে তাঁর মনে হলো, বেস অ্যালামেডার সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যাপারটা জানানো দরকার। কিন্তু যদি ভুল হয়ে থাকে, তাহলে কৈফিয়ত দিতে হবে, আর সেটা খুব একটা সুখের বিষয় হবে না। সবচেয়ে ভাল হয়, আগে ভালমত দেখে নিয়ে নিশ্চিত হয়ে নেয়া। তারপর রিপোর্ট করা যাবে।
'রেঞ্জ বলো, স্টাইন,' বললেন তিনি।
'নয়শো গজ। দ্রুত এগোচ্ছি।' এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে সোনারম্যান বলল, 'আটশো।' আবার এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে বলল, 'সাতশো।'
পাঁচশো গজ দূরে থাকতে স্কোপের ভিতর দিয়ে তাকালেন আবার পাইক। শক্তিশালী যন্ত্রের ভিতর দিয়ে দিনের আলোর মত দেখা গেল দৃশ্যটা।
'টার্গেট'টা দেখার সঙ্গে সঙ্গে গতিবেগ পাঁচ নটে নামিয়ে ফেলার আদেশ দিলেন পাইক। চুপি চুপি গিয়ে অপরাধীকে ধরে ফেলার ইচ্ছে। স্পটলাইটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দুজন সিম্যান, নির্দেশ পাওয়া মাত্র আলো জ্বেলে দেবে।
'টার্গেট আবার থেমে গেছে, সার,' সোনারম্যান জানাল।
খাঁড়ির মুখে প্রবেশ করল পেট্রোল বোট। সামনে ঝুঁকলেন পাইক।

অবশেষে পরিষ্কার দেখতে পেলেন টার্গেটটা। সরু, লম্বা, পিঠের খুব সামান্য অংশ ভেসে রয়েছে পানিতে। এ ধরনের জলযান আগে কখনও দেখেননি তিনি।

'কী এটা?' জোরে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন তিনি। মনে করার চেষ্টা করলেন, নেভি কোনও ধরনের পরীক্ষা চালাচ্ছে কি না এই এলাকায়।

একশো পঞ্চাশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেল নেভির পেট্রোল বোট।

'সার!' রবার্ট স্টাইনের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ বেজে উঠল পাইপের ভিতর দিয়ে। 'প্রপেলারের গতি দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এগিয়ে আসছে ওটা।'

ছুরির মত পানি কেটে চক্কর দিল 'টার্গেট'টা। একইসঙ্গে তলিয়ে যেতে থাকল পানিতে।

'টার্গেট ডাইভ দিচ্ছে!' সোনার অপারেটরের কণ্ঠে উত্তেজনা।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না পাইক। প্রায় পুরোটাই এখন ডুবে গেছে জলযানটার, পিঠটাকে মনে হচ্ছে বিশাল গিরগিটির পিঠের মত। পেরিস্কোপ আর অ্যানটেনাটা পানির ওপর মাথা তুলে রেখেছে। বিস্ময়ে বিড়বিড় করলেন তিনি, 'এ হতে পারে না!'

'টার্গেট এখন বিশ ফুট দূরে, আরও তলিয়ে যাচ্ছে!' স্টাইন জানাল। 'অবস্থান পরিবর্তন করেছে।'

'এদিকে আসছে?' পাইক জিজ্ঞেস করলেন। যানটাকে খোলা সাগরে বেরোতে হলে তাঁদের পাশ কাটিয়েই যেতে হবে।

'সোজা আমাদের দিকেই আসছে, সার! স্পিড এখন দশ নট। দ্রুত বাড়ছে সেটা।'

'স্পটলাইট!' চেঁচিয়ে বললেন পাইক। সঙ্গে সঙ্গে দুটো উজ্জ্বল

আলোর রশ্মি জাহাজের সামনের পানিকে আলোকিত করে দিল। রহস্যময় জলযানটার কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না আর, শুধু যেখানে তলিয়ে গিয়েছিল সেখানে মৃদু ঢেউ ছাড়া। 'স্টাইন! ডান দিক, নাকি বাঁ দিক দিয়ে কাটানোর চেষ্টা করছে?'

'কোনটাই না, সার! সোজা আমাদের দিকে আসছে!'

'হেলম্‌স্‌ম্যান, জলদি বাঁ দিকে সরাও!' হুইল ধরে থাকা নাবিককে আদেশ দিলেন পাইক।

বাঁ দিকে তীক্ষ্ণ মোচড় দিয়ে সরে যেতে চাইল জাহাজ, তবে খুব সামান্যই সফল হলো, কারণ, দেরি হয়ে গেছে। পাইকের মুখ থেকে নির্দেশ বেরোনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সোনার অপারেটরের কণ্ঠ ভেসে এল, 'সার, ওটা আমাদের দিকে ফায়ার করছে...'

প্রচণ্ড বিস্ফোরণে থরথর করে কেঁপে উঠল পেট্রোল বোট। পানি থেকে শূন্যে উঠে পড়ল। পরক্ষণে গ্রাস করে ফেলল যেন মস্ত একটা আগুনের বল। টুকরো টুকরো হয়ে গেল বোট। ভাঙা টুকরোগুলো সাগরের পানিতে ঝরে পড়তে লাগল বৃষ্টির মত।

বোটের টুকরোর সঙ্গে মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের টুকরোও রয়েছে...

দুই

শিকারি পরিণত হয়েছে শিকারে ।

ঠিক কখন থেকে যে ওকে অনুসরণ করা হচ্ছে, জানে না পাশা। ভাল নাম ইউসুফ পাশা, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির একজন দুর্ধর্ষ ফিল্ড এজেন্ট। প্রথম টের পেয়েছে, একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁচের ওপাশে সাজানো জিনিসগুলো দেখার সময়, আধবুক পিছনে ঢেঙা একটা লোককে স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে।

একেবারেই নবিস মনে হলো লোকটাকে। পেশাদার কেউ এভাবে খোলাখুলি সামনে এসে তাকিয়ে থাকত না।

সাইড স্ট্রিট ধরে ধীরেসুস্থে হেঁটে চলল পাশা, এমন ভাব দেখাল যেন লক্ষই করেনি ব্যাপারটা। দুই হাত পকেটে ঢোকানো। সামনের

মোড়টা ঘুরেই হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। পথচারীদের মাঝখান দিয়ে পথ করে এঁকেবেঁকে এগোল।

কী-ওয়েস্টে এখন শেষ বিকেল। রাস্তায় লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য মানুষ, সুযোগ পেয়ে ফ্লোরিডার রোদ শুষে নিচ্ছে যেন শরীরে।

একটা কাপড়ের দোকানের দরজার আড়ালে ছায়ায় গা মিশিয়ে দাঁড়াল পাশা। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল লোকটা, ডানে-বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে, দরজার আড়ালে দাঁড়ানো পাশাকে দেখতে পেল না। আরও দশটা সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল পাশা। তারপর সাবধানে সরে এসে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখল।

পরের মোড়টার কাছে পৌঁছে গেছে লোকটা। অস্থির ভঙ্গিতে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছে, বোঝার চেষ্টা করছে কোথায় লুকাল পাশা। পরনে জিনসের প্যান্ট আর খাটো-হাতা শার্ট, বাঁ হাতে টাট্টু আঁকা দেখা যাচ্ছে। মাথার বালি-রঙা চুলের ওপর বসানো একটা রঙচটা ক্যাপ।

এগিয়ে চলল লোকটা। পিছন থেকে অনুসরণ করল পাশা। কার হয়ে কাজ করছে লোকটা, আর ওকেই বা চিনল কী করে, জানা জরুরি।

ওর দক্ষিণ ফ্লোরিডায় আসার খবর জানে আমেরিকার মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন লোক। ওর বন্ধু আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিসের অপারেশন গ্রুপের ডিরেক্টর স্টিফেন হান্টার, মিশন কন্ট্রোলার জোয়ানা কলিনস, ও পরিচালক 'মিস্টার এক্স'। পরিষ্কার বুঝতে পারছে পাশা, খবরটা যেভাবেই হোক লিক-আউট হয়েছে।

শত্রুপক্ষ ওর কী-ওয়েস্টে আসার কথা জেনে গেছে।

একটা নতুন মাদক পাচারকারী চক্র সক্রিয় হয়েছে এখানে। আমেরিকান ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির সূত্রমতে প্রচুর পরিমাণ কোকেইন ফ্লোরিডার 'কী'-গুলো দিয়ে মেইনল্যান্ডে ঢুকছে। ধারণা করা হচ্ছে 'কী-ওয়েস্ট' থেকে হাতবদল হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে এই মাদক, তবে কর্তৃপক্ষ কোনমতেই বুঝতে পারছে না, এই কোকেইন ঢুকছে কীভাবে এখানে।

বহুবার মাদকসম্রাটদের বিরুদ্ধে টক্কর লেগেছে পাশার। বার বার ওদের পাইপলাইনে বাধার সৃষ্টি করেছে ও। একটা দল ধ্বংস হলে নতুন করে গজিয়ে ওঠে আরেকটা। আবার নতুন করে মাদক সরবরাহ শুরু করে। বাংলাদেশও এদের কবল থেকে রেহাই পায়নি।

একেক সময় পাশার মনে হয়, ভয়ঙ্কর এই চক্রের হাত থেকে কোনদিনই বুঝি রেহাই পাবে না পৃথিবীবাসী। কিন্তু সে-ও ছাড়ার পাত্র নয়। ওর কাছে এটা এক বিশাল চ্যালেঞ্জ, মাদকচক্রগুলোকে দমন করা। কিন্তু বড় কঠিন কাজ। একেক সময় মনে হয় অসম্ভব। তবু হাল ছাড়ে না ও। নিজেকে বোঝায়, হতাশ হওয়ার কিছু নেই। একটা চক্রকে ধ্বংস করে দেয়ার পর ওই অঞ্চলে কিছুদিনের জন্য অন্তত মাদক ব্যবসায়ীদের কার্যক্রম বন্ধ থাকে। এই বন্ধ থাকার কারণে মাসে যদি একজন মানুষও নেশায় আসক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে, একটি স্কুলপড়ুয়া ছেলে কিংবা মেয়েও বেঁচে যায়, সেটাও বিরাট লাভ। আর তাই, পৃথিবীর যে দেশেই থাকুক না কেন পাশা, মাদক সরবরাহকারীদের সন্ধান পেলে ওদের ধ্বংস করতে লেগে যায়–যদি হাতে সময় থাকে, কিংবা অন্য কোন জরুরি কাজে

ব্যস্ত না থাকে।

যা-ই হোক, এ মুহূর্তে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না ওর অনুসরণকারী। এগোনোর সময় প্রতিটি সাইড স্ট্রিটে পাশাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে লোকটা, ক্রমেই উদ্বেগ বাড়ছে ওর। একটা সিফুড রেস্টুরেন্টের কাছে গিয়ে তাতে ঢুকে পড়ল লোকটা। রাস্তা পেরিয়ে এল পাশা। পার্ক করে রাখা একটা ভ্যানের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে রেস্টুরেন্টের ভিতরে তাকাল ও। কাচের বড় জানালা দিয়ে দেখতে পেল, পে ফোন থেকে ফোন করছে লোকটা।

লোকটার হাবভাব আর চেহারাই বলে দিচ্ছে, প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। অবশেষে রিসিভার নামিয়ে রেখে রেস্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে এল লোকটা।

ওকে দূরে যাওয়ার সুযোগ দিল পাশা, তারপর আবার পিছু নিল। মাঝখানে বেশ খানিকটা দূরত্ব রাখল, আর লক্ষ রাখল, সব সময়ই যাতে অন্তত দু-তিনজন পথচারী ওদের মাঝখানে থাকে। শীঘ্রি ডকের কাছে চলে এল দুজনে। মোড় নিয়ে সরু রাস্তা ধরে পুরানো একটা দোতলা বাড়ির দিকে এগোল লোকটা। এক হাঁটু গেড়ে বসে জুতোর ফিতে বাঁধার ভান করল পাশা।

বাড়ির দরজায় টোকা দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না লোকটা। যেন নিজের বাড়ি, এমন ভঙ্গিতে ভিতরে ঢুকে দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সরু রাস্তাটা আর মেইন রোডের সংযোগস্থলে পিছিয়ে এল পাশা, রাস্তা পেরোল, তারপর এগিয়ে গেল পুরো এক ব্লক। তারপর ডানে মোড় নিয়ে হেঁটে এসে দাঁড়াল দোতলা বাড়িটার পিছনে। সামনের চেয়ে পিছনটা আরও মলিন। রঙের

চলটা উঠে দেয়াল থেকে খসে পড়েছে এখানে ওখানে। নীচতলার একটা জানালার কাঁচ ভাঙা।

জ্যাকেটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে বাঁ বগলের নীচে হোলস্টারে রাখা ৯ এমএম বেরেটা পিস্তলটা বের করে আনল পাশা।

চট করে একবার দুই পাশে তাকিয়ে দেখে নিল কেউ নজর রাখছে কি না। তারপর কোমর সমান উঁচু দেয়ালটা লাফিয়ে পেরিয়ে এল। ঝট করে উবু হয়ে দাঁড়াল একটা ঝোঁপের আড়ালে। বাড়ির ভিতরে অ্যালার্ম বেল বাজল কি না কান পেতে শুনল।

ঘণ্টা বাজল না। ও যে ঢুকেছে সেটাও কেউ লক্ষ করেছে বলে মনে হলো না। পা টিপে টিপে পিছনের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল পাশা। নব চেপে ধরে আস্তে মোচড় দিতেই ঘুরে গেল ওটা, তালা দেয়া নেই। কিন্তু অসতর্ক হলো না ও। ঢোকার আগে বাঁয়ে সরে চলে এল ভাঙা জানালাটার কাছে।

জানালায় পর্দা টানা। ভিতর থেকে দুজন লোকের তর্ক শোনা যাচ্ছে। ওরা চাপাস্বরে কথা বললেও কথাগুলো পরিষ্কার শুনতে পেল পাশা।

'আমি বলছি, আমি যে পিছু নিয়েছি ও ব্যাটা কিছুই বুঝতে পারেনি। ওর হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত।'

'অপ্রত্যাশিত?' দ্বিতীয় কণ্ঠটা বলল। 'তোমার মাথায় ঘিলু আছে, নাকি গোবর পোরা, টনি? শয়তানটা যে তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে, এটাও বুঝতে পারনি। ডুয়েরো জানতে পারলে এখন তোমার কী অবস্থা করে দেখো।'

'ডুয়েরোকে আমি ভয় পাই না।'

'পাওয়া উচিত। ও যে কী ভয়ঙ্কর লোক, এখনও বোঝনি। হাসিমুখে

তোমাকে খুন করবে, অথচ চোখের পাপড়িটাও সামান্যতম কাঁপবে না ওর। জানো, নিজের ভাইকেও মাপ করেনি ও; ভাই ভুল করেছে জানা মাত্র খুন করেছে।' দ্বিতীয় লোকটার চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল। 'পরে জানল, ভুলটা ওর ভাই করেনি, আরেকজন করেছে। সেই লোকটাকে তখন এভারগ্লেডে ধরে নিয়ে গিয়ে জ্যান্ত ফেলে দিল অ্যালিগেটরের মুখে ডুয়েরো।'

'আমাকে এত কথা শুনিয়ে লাভ নেই, হ্যাসি,' টনি বলল, তবে গলায় জোর নেই, 'আমি যা বলার বলেছি।'

ক্ষীণ হয়ে গেল দুজনের কণ্ঠস্বর। দরজার কাছে সরে এল পাশা। ঢুকতে যাবে, ঠিক এ সময় দরজার ওপাশে পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে শুনল।

'মনে মনে খোদাকে ডাকো, যাতে ডুয়েরোর মেজাজ ভাল থাকে,' হ্যাসির কথা শোনা গেল। 'এ সব ঝামেলা মিটানোর জন্য আমাদেরকে ভাল টাকা দেয় ও। আর তুমি ঝামেলা আরও বাড়িয়েছ শুনলে, মোটেও খুশি হবে না।'

পাক খেয়ে ঘুরল পাশা। ছোটখাট ঝোঁপঝাঁড় আর অযত্নে বেড়ে ওঠা ঘাসের মধ্যে লুকানোর জায়গা নেই কোথাও। দৌড়ে সরে এল বাড়িটার এক কোণে, আর ঠিক এ সময় খুলে গেল দরজাটা।

কালো চামড়ার লোক হ্যাসি। গাট্টাগোট্টা শরীর। মস্ত থাবা। গায়ে হালকা জ্যাকেট। ডান বগলের নীচে ফুলে থাকা জায়গাটা বুঝিয়ে দিল কী রয়েছে ওখানে। হাতে একটা সবুজ রঙের ময়লা ফেলার ব্যাগ। কোণের ডাস্টবিনে ব্যাগের আবর্জনাগুলো ফেলল।

দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে টনি, পাশার পিছু নিয়েছিল যে লোকটা। হ্যাসিকে বলল, 'আমার পরামর্শ যদি শোনো, জিনিসপত্র

গুছিয়ে নিয়ে এখুনি মেইনল্যান্ডের দিকে চলে যাওয়া উচিত আমাদের। এই কী-তে আয়-উপার্জন বড় কম। তুমিও জানো সেটা। ভাগ্যিস ডুয়েরোর লোক এসে এই কাজটা দিয়েছিল আমাদের, নইলে খাওয়ার জন্য টুরিস্টদের কাছে ভিক্ষে করা ছাড়া উপায় ছিল না।'

'আরে ধূর, তোমার কথা শুনলে না পিত্তি জ্বলে!'

'এর চেয়ে ভাল বুদ্ধি আর দিতে পারো?'

'পারি। আরও মাস ছয়েক এখানে থাকব আমরা, ডুয়েরোর আরও কয়েকটা কাজ করব, কিছু টাকা জমলে তখন মায়ামিতে চলে যাব।'

'আরও ছয় মা-আ-স?' সুর করে টেনে টেনে বলল টনি। 'এ তো মেলা সময়।'

শুধু এখানে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে আসল তথ্য জানতে পারবে না বুঝে তাড়াতাড়ি বাড়ির পাশ ঘুরে সামনের দিকে চলে এল পাশা। সামনের দরজা খুলে ঢুকে পড়ল। লম্বা বারান্দার শেষ মাথায় এদিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল টনিকে।

নিঃশব্দে এগিয়ে প্রথম যে ঘরটা দেখল, তাতেই ঢুকে পড়ল পাশা। একটা লিভিং রুম। সস্তা আসবাবপত্রে সাজানো।

একটা খোলা আলমারি দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। ঢুকে পড়ল ওটার ভিতরে। দরজাটা টেনে বন্ধ করল, আর ঠিক এ সময় কানে এল ভারী পায়ের শব্দ। নিশ্চয় হ্যাসি, ফিরে এসেছে। দুজনকে কাবু করা কিছুই না ওর জন্য, কিন্তু আরও কিছুক্ষণ কথা শোনার অপেক্ষায় রইল ও। ডুয়েরোর ব্যাপারে আরও তথ্য জানতে হবে।

নামটা আগেও শুনেছে পাশা। জেনেছে, এখানকার কোকেইন মার্কেট নিয়ন্ত্রণ করে এব্রো ডুয়েরো, আর বিশাল পরিমাণে মাদক

সরবরাহ করে আমেরিকার বড় বড় শহরে। কিন্তু ডুয়েরো কোথায় থাকে, ওর প্রিয় ক্লাব কোনটি, কেউ জানে না। কিংবা জানলেও ভয়ে মুখ খোলে না। হ্যাসির মতই এখানকার সবাই যমের মত ভয় করে ডুয়েরোকে।

শুধু একজন বাদে। বোট ভাড়া নিয়ে দেয়ার একজন দালাল, যে সামান্য কিছু তথ্য দিতে পেরেছে পাশাকে।

বাসন-পেয়ালার ঠুনঠুন, খাবারের আলমারির দরজা খোলার মৃদু ক্যাঁচকোঁচ, আর মেঝেতে চেয়ারের পায়া ঘষার শব্দ শুনল পাশা। বুঝল, রাতের খাবার খেতে বসেছে লোক দুজন।

একটা ফাঁকে কান চেপে ধরে রাখল ও। কথা বলছে লোকগুলো, কিন্তু এতই আস্তে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কয়েক মিনিট কাটল। আলমারি থেকে বেরিয়ে এল পাশা। নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল বারান্দায়। বিশ ফুট দূরের একটা ঘরে আলো দেখে বুঝতে পারল, রান্নাঘরটা কোথায়।

পা টিপে টিপে রান্নাঘরের দরজার দিকে এগোল ও। টনির কথা কানে এল, 'ডুয়েরোর সঙ্গে কখন দেখা করব আমরা?'

'ন'টা।'

'ওর ঘরে, নাকি বোটে?'

কান খাড়া করে ফেলল পাশা। জবাবে হ্যাসি কী বলে শোনার অপেক্ষা করছে। বুঝল, এদেরকে অনুসরণ করলে ডুয়েরোর কাছে চলে যেতে পারবে। হ্যাসি আর কিছু বলার আগেই লিভিং রুমের টেলিফোন বেজে উঠল। রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরোল টনি। আরেকটু হলেই মুখোমুখি ধাক্কা খেত পাশার গায়ে।

হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল যেন টনি। মুহূর্তে হাত চলে গেল ঢোলা

শার্টের নিচে। একটা .৪০ ক্যালিবারের এসআইজি-সাউয়ার পি-২২৯ পিস্তলে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন পাশার শরীরে। লোকটা পিস্তল ধরা কব্জি চেপে ধরে জোরে মোচড় দিল, একই সঙ্গে এক হাঁটু চালাল ওর দুই পায়ের উরুর ফাঁকে। বিদঘুটে শব্দ বেরোল টনির মুখ থেকে, মুখটা লাল হয়ে গেল।

টনির নিস্তেজ দেহটাকে সজোরে দেয়ালে ধাক্কা দিয়ে ফেলল পাশা, আঙুল সোজা রেখে তালু দিয়ে প্রচণ্ড থাবড়া মারল নাকেমুখে। নাকের কার্টিল্যাজ ভেঙে ফিনকি দিয়ে রক্ত এসে পড়ল পাশার গায়ে। দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে ধীরে ধীরে ধসে পড়ে যাচ্ছে টনি, আরেকটা ঘুষি খেলেই বেহুঁশ হয়ে যাবে। হাত তুলল পাশা, কিন্তু নামিয়ে আনতে পারল না, তার আগেই রান্নাঘরের দিক থেকে ওর গায়ের ওপর এসে পড়ল যেন দুশো পঁচাত্তর পাউন্ড ওজনের একটা ষাঁড়।

প্রায় উড়ে গিয়ে উল্টোদিকের দেয়ালে পড়ল পাশা, হুস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ফুসফুসের সমস্ত বাতাস। মেরুদণ্ডে ছড়িয়ে গেল তীক্ষ্ণ ব্যথা। অজগরের মত মোটা একটা বাহু ওর কোমর পেঁচিয়ে ধরে টান দিয়ে মেঝে থেকে এমনভাবে উঁচু করে ফেলল, যেন পাশা একটা শিশু।

'এখানে ঢোকাটা মোটেও উচিত হয়নি তোমার, হাঁদা!' গর্জে উঠল হ্যাসি। 'মিস্টার ডুয়েরোর বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে তোমার চেহারা।' হিসিয়ে উঠে পাশার কোমরে হাতের চাপ আরও বাড়াল ও। 'ডুয়েরো জানতে চান, কী-ওয়েস্টে এসে মানুষকে এত প্রশ্ন করে বেড়াচ্ছ কেন। আমাকে বলবে?'

অনেকটা সামলে নিয়েছে পাশা। হ্যাসির চোয়ালে ঘুষি মারল। মনে হলো, ইটের দেয়ালে আঘাত হেনেছে। ঘুষিটাকে যেন হেসে উড়িয়ে দিল হ্যাসি। হাতের চাপ বাড়াল। কোমরের ব্যথাটা পাশার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে।

'ব্যথা লাগছে, হাঁদা?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল হ্যাসি। 'যখন ছাড়ব, পাঁজরের একটা হাড়ও আর আস্ত থাকবে না তোমার। হাড়-মাংস সব ভর্তা হওয়ার আগেই আমাকে বলো, এত প্রশ্ন করে বেড়াচ্ছিলে কেন?'

কথা বলে বেশি সময় দিয়ে ফেলেছে হ্যাসি। মূল্যবান সেকেন্ডগুলোকে কাজে লাগাল পাশা। পা দুটো দেয়ালে ঠেকিয়ে আচমকা ঠেলা মারল। পিছনে হেলে পড়তে পড়তে সোজা হওয়ার চেষ্টা করল হ্যাসি। কিন্তু পারছে না। উল্টে পড়ে যাচ্ছে। পাশাকে ছেড়ে পতনের ধাক্কা ঠেকাতে দুই হাত পিছনে নিয়ে গেল।

সুযোগটা হাতছাড়া করল না পাশা। হ্যাসি সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আগেই পাশার হাতের দুটো মারাত্মক কারাতে মার খেল। সাধারণ কেউ হলে এই আঘাতেই ধরাশায়ী হতো। কিন্তু কালো দৈত্যটাকে কাবু করা এত সহজ হলো না। পাশার মনে হলো গাছের গুঁড়ির মত দুটো পা ছুটে এসে আঘাত করল ওর বুকে।

যেন গুলতি থেকে ছুঁড়ে দেয়া হলো পাশাকে, ভারি পাথরের মত ছয় ফুট শূন্যে লাফিয়ে উঠল ওর দেহটা। কাত হয়ে কাঁধের ওপর ভার রেখে মেঝেতে পড়ল পাশা। পরক্ষণে পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে দক্ষ দড়াবাজিকরের মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

উঠে পড়েছে হ্যাসিও। খেপা ষাঁড়ের মত ছুটে এল। দুই হাত চালাচ্ছে সমানে। কিলঘুষি মেরে অজ্ঞান করে ফেলতে চাইল

প্রতিপক্ষকে।

কিন্তু এত সহজে পাশাকে কাবু করতে পারল না ও। কারাতের কায়দায় দুই হাতে ঘুষিগুলোকে সরিয়ে দিতে লাগল পাশা, গায়ে লাগতে দিল না। তারপর সুযোগ বুঝে হাঁটু তুলে সজোরে চালিয়ে দিল হ্যাসির থুঁতনি লক্ষ্য করে। টলে উঠল ষাঁড়, কিন্তু মাটিতে পড়ল না।

পা সোজা করে হ্যাসির পেটে কারাতে মার মারল পাশা। তাতেও কাবু করা গেল না দৈত্যটাকে, পাশার মনে হলো পুরু রবারের গায়ে আঘাত হানল ওর পা। পিপার মত বুকের ভিতর থেকে ঘড়ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে হ্যাসির–ক্রুদ্ধ গ্রিজলি ভালুকের মত, দুই হাত ছড়িয়ে প্রতিপক্ষকে জড়িয়ে ধরার জন্য ঝাঁপ দিল সামনে।

দ্বিতীয়বার নিজেকে আর হ্যাসির নাগালে পড়তে দিল না পাশা। পিছাতে পিছাতে একটা দরজার কাছে চলে এসেছে। দরজার বাজু ধরে দোলা দিয়ে চলে এল ভিতরে। কিন্তু দরজা ছাড়ল না। আবার দোলা দিয়ে দরজাসহ সামনে এগোল, পা দুটো সোজা করে বাড়িয়ে দিয়েছে সামনের দিকে।

পাশাকে ধরে ছুটে আসছে হ্যাসি। গতি কমানোর আগেই ওর বুকে লাগল পাশার পা, উড়ে গিয়ে ধাক্কা খেল বারান্দার উল্টোদিকের দেয়ালে। মনে হলো পুরো বাড়িটা কেঁপে উঠেছে। মাথা ঝাড়া দিতে দিতে গর্জন করে উঠল দৈত্য। নতুন করে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে এবার আর তাড়াহুড়া করল না, মস্ত থাবাকে মুঠো পাকিয়ে সাবধানে এগিয়ে এল।

ঘরের মাঝখানে চলে এসেছে পাশা, যাতে নড়ার জায়গা পায়। ওর ডানে একটা বিছানা, বাঁয়ে ড্রেসার, তাতে ছড়ানো কলম, পেন্সিল

আর কাগজ। ওর সামান্য পিছনে একটা কাঠের চেয়ার।

হ্যাসির কালো চোখে রক্তের নেশা দেখল ও। আচমকা ছুটে এল দৈত্যটা। চোখের পলকে দেহ ঘুরিয়ে পিছনের চেয়ারটা তুলে নিয়ে গায়ের জোরে বাড়ি মারল হ্যাসির উঁচু করে রাখা মুখে। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল চেয়ারটা। ব্যথা আর রাগে গুঙিয়ে উঠল দানব।

এক ভুরুর ওপরের চামড়া কেটে রক্ত পড়ছে। দাঁত বের করে গর্জে উঠল হ্যাসি, 'জাহান্নামে যাক ডুয়েরোর প্রশ্ন করা। আগে তোমাকে আমি ভর্তা বানাব, তারপর কিছু অবশিষ্ট থাকলে তুলে নিয়ে যাব ডুয়োরোর কাছে!'

পাশাও এতক্ষণ যুঝেছে দৈত্যটাকে কাবু করে প্রশ্ন করার জন্য। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, প্রশ্ন করার চেয়ে ওর হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোটাই বেশি জরুরি। সামান্যতম সুযোগ দিলে খুন করে ফেলবে ওকে হ্যাসি। তবু দৈত্যটাকে কাবু করে কিছু তথ্য আদায়ের শেষ চেষ্টা করল ও। কোন একটা অস্ত্র পাওয়া যায় কি না, দেখল।

যে মুহূর্তে অন্যদিকে মুখ ফেরাল পাশা, আঘাত হানল হ্যাসি। এত বিশালদেহী একজন মানুষের তুলনায় অবিশ্বাস্য দ্রুত দৈত্যটা। চোখের পলকে পাশার ওপর এসে পড়ল ও। হাতের আঙুল সোজা করে হ্যাসির গলায় কারাতের খোঁচা মারতে গেল পাশা, কিন্তু ঝট করে গলা সরিয়ে ফেলল হ্যাসি, পাশার আঙুলগুলো ওর গলা স্পর্শ করে পাশ কেটে বেরিয়ে গেল।

'তোমার এ সব চালাকির মার দিয়ে আমার কিছু করতে পারবে না, হাঁদা!' হ্যাসি বলল।

বেশ কয়েকটা মারাত্মক ঘুষি ঠেকাল পাশা। ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে। এক সেকেন্ড পরেই দেখল, কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ও।

থেমে গেল হ্যাসি। পাশার দিকে তাকিয়ে হাসল। যেন বিকৃত আনন্দ পাচ্ছে। বলল, 'বেরোনোর কোন জায়গা রাখলে না, আমার পাশ দিয়ে তো যেতেই পারবে না।'

একটা বুদ্ধি এল পাশার মাথায়। শুরু থেকেই দেখছে, বেশি কথা বলা হ্যাসির স্বভাব। জিজ্ঞেস করল, 'একটা চুক্তিতে এলে কেমন হয়?'

চোখ মিটমিট করল হ্যাসি। 'চুক্তি? দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তোমার, এ অবস্থায় চুক্তি কীসের?' কথাটায় এতই আনন্দ পেল ও, পিছন দিকে মাথা এলিয়ে হা-হা করে হেসে উঠল।

আর এ ধরনের একটা সুযোগই চাচ্ছিল পাশা। লাফ দিয়ে সামনে এসে ডান গোড়ালি দিয়ে প্রচণ্ড জোরে ছেঁচা দিল হ্যাসির পায়ের আঙুলে।

মট করে শব্দ হলো। হ্যাসির হাসিটা আটকে গেল মাঝপথে। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল, 'আমার আঙুল ভেঙে ফেলেছ!'

শুধু আঙুল ভেঙেই ক্ষান্ত হলো না পাশা। দুই হাতের তালু মেঝেতে রেখে তাতে ভর দিয়ে দেহ লম্বা করে দিয়ে ঘোরাল। ওর জঙ্ঘা বাড়ি খেল হ্যাসির হাঁটুর পিছনে। দৈত্যের পা দুটো ওপরে উঠে গেল। আরও একবার বাড়ি কাঁপিয়ে ধুড়ুস করে পড়ল মেঝেতে।

হ্যাসি উঠে বসতে বসতে জ্যাকেটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে পিস্তলটা বের করে ফেলেছে পাশা। হ্যাসির কপালে দ্রুত বাড়ি মারল তিনবার। শেষ বাড়িটাতে গুঙিয়ে উঠে, চোখ বন্ধ করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল হ্যাসি।

বারান্দা থেকে ধাতব একটা শব্দ কানে এল পাশার। চোখের পলকে হ্যাসির দেহের ওপর দিয়ে গড়িয়ে অন্যপাশে চলে এল ও। উপুড়

হয়ে পিস্তল তাক করল দরজার দিকে।

এসআইজি-সাউয়ারটা দুই হাতে চেপে ধরেছে টনি। মুখে লেগে আছে চটচটে রক্ত। রাগে বিকৃত হয়ে গেছে ঠোঁটের দুই কোণ। দুইবার ট্রিগার চাপল।

পাশার মুখের সামনে কাঠের মেঝের চলটা তুলল বুলেট। নির্দ্বিধায় গুলি করল পাশা। মনে হলো কাঠের মুগুর দিয়ে আঘাত করেছে কেউ টনিকে, বুলেটের ধাক্কায় দেয়ালে গিয়ে পড়ল।

আরেকবার দেয়ালে পিঠ রেখে বসে পড়ছে ও। দেয়ালে লেগে যাচ্ছে রক্তের দাগ। কোনমতে উঁচু করল পিস্তলটা। আরও অন্তত একটা গুলি করতে চায়। থরথর করে কাঁপছে হাতটা। কিন্তু গুলি করতে দৃঢ়সংকল্প।

সেই সুযোগ আর ওকে দিল না পাশা। গুলি করল আবার। টনির দুই চোখের মাঝখানে কপালে লাল আরেকটা চোখের মত দেখাল বুলেটের ফুটোটা।

টনির মাথার পিছনটা দেয়ালে বাড়ি খেল। দু'একটা মুহূর্ত ছটফট করল মেঝেতে পড়ে যাওয়া দেহটা, তারপর নিথর হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল পাশা। টনির কাছে এসে নাড়ি দেখল। থেমে গেছে। দ্রুত লাশের পকেটগুলো খুঁজে দেখল ও। একটা ওয়ালেট পাওয়া গেল, তাতে সত্তর ডলার আর কিছু খুচরো রয়েছে। একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স আর হাসিমুখে তাকিয়ে থাকা একটা তরুণী মেয়ের ছবিও আছে, তবে এগুলো থেকে এব্রো ডুয়েরোর কোন সন্ধান মিলল না।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল পাশা। এখনও সুযোগ আছে। দুজনের একজন গেছে, আরেকজন হাতে রয়ে গেছে। ওকে

কথা বলাতে হবে। হ্যাসির দিকে ঘুরতে গেল, ঠিক এ সময় গায়ের ওপর এসে পড়ল যেন একটা এক্সপ্রেস ট্রেন। হ্যাসির দেহ প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে ওকে দেয়ালের ওপর ফেলে ঠেসে ধরল, হাত থেকে ছুটে গেল পিস্তলটা। চোখের সামনে একটা তারা লক্ষ-কোটি টুকরো হয়ে ফেটে পড়ল যেন। বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে লাগল বারান্দাটা।

'তোমাকে মরতে হবে, হাঁদা!' কানের কাছে শোনা গেল হ্যাসির খসখসে কণ্ঠ।

লোহার সাঁড়াশির মত কঠিন আঙুল ঘাড় চেপে ধরল পাশার। নখগুলো ঢুকে যাচ্ছে চামড়া কেটে। ঘুরতে শুরু করেছে কব্জিটা। প্রাণ বাঁচানোর প্রচণ্ড তাগিদ যেন জ্ঞান হারাতে দিল না পাশাকে। ও বুঝে গেছে, ওর ঘাড় মটকাতে যাচ্ছে হ্যাসি। কনুই দিয়ে হ্যাসির পেটে গুতো মারার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো।

সোজা হওয়ার চেষ্টা করছে পাশা। কিন্তু চেপে ধরে নুইয়ে রেখেছে হ্যাসি। ঘোরার চেষ্টা করল পাশা। পারল না। ঠেলে সরানোর চেষ্টা করল হ্যাসিকে। কিন্তু পর্বতের মত অটল রইল দৈত্যটা। আর ইতিমধ্যে ক্রমেই ওর আঙুলগুলো আরও বেশি চেপে বসছে পাশার ঘাড়ে।

তীব্র ব্যথায় চিন্তাশক্তি ঘোলা হয়ে আসছে ওর। খুব শীঘ্রি কিছু একটা করতে না পারলে বেহুঁশ হয়ে যাবে। বহু চেষ্টায় শরীরটাকে আরও নিচু করে মরিয়া হয়ে মেঝে হাতড়াতে লাগল পিস্তলটার জন্য। একটা পিস্তল ঠেকল আঙুলে, তবে ওরটা নয়। তাতে কিছু যায় আসে না।

পিস্তলটা চেপে ধরল ও। কুৎসিত হাসি আর রক্তে ভেজা হ্যাসির বিকৃত হয়ে যাওয়া মুখটা দেখল। চোখের পলকে পিস্তলটা উঁচু করে

একবারে চোখের কাছে ঠেকিয়ে গুলি করল পাশা। হ্যাসির ডান চোখের গোলকটা ফেটে গেল।

একটা মুহূর্ত কিছুই ঘটল না। ঠেলা দিয়ে ওকে যখন সরিয়ে দিতে গেল পাশা, টলে উঠল দৈত্যটা। উপুড় হয়ে পড়ে গেল টনির লাশের ওপর।

হাঁপাচ্ছে পাশা। লাশ দুটোর দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল। এত কষ্ট সব বিফলে গেল। শুধু শুধু দুজন লোকের প্রাণ গেল, সে নিজেও মরতে মরতে বাঁচল, কিন্তু এব্রো ডুয়েরো কোথায় থাকে, জানা হলো না।

তিন

পিয়ারে যখন উপস্থিত হলো পাশা, জ্বলন্ত লাল সূর্যটা তখন আকাশের পশ্চিম সীমান্তে। উপসাগরের শান্ত পানিতে রোদেপোড়া ট্যুরিস্টরা সারাদিন সাগরে কাটিয়ে ফিশিং বোটে করে ফিরে আসছে। বড় বড় ফুল ছাপা কাপড়ের শার্ট পরা গোলগাল একজন মানুষ একটা বোটের কিনারে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে দড়িতে ঝোলানো একটা হাঙরের প্রায় গা ঘেঁষে, স্ত্রীকে ছবি তোলার পৌজ দিচ্ছে। মাথার ওপরে গাল উড়ছে। কিছু কিছু দুঃসাহসী পাখি মানুষের একেবারে কাছে চলে আসছে খাবারের লোভে, বিরক্ত করছে রীতিমত।

ডকের কিনার ধরে হাঁটছে পাশা। একটা উঁচু প্ল্যাটফর্মওয়ালা প্রায় নতুন পাওয়ারবোটের কাছে এসে থামল। বোটটার নাম 'সি কুইন'।

একটা ফাইটিং চেয়ারে বসে আছে হাফপ্যান্ট আর স্যাণ্ডেল পরা একজন ব্রোঞ্জ রঙের মানুষ। মাথায় কালো চুলের বোঝা আর কালো ঘন ভুরু। চেহারা বলছে, লোকটা স্প্যানিশ। পাশার ওপর চোখ পড়তে হেসে বলল, 'হোলা, সেনিয়র। দেরি করে ফেলেছেন।'

'হ্যাঁ, একটা জরুরি কাজ সেরে আসতে হলো,' বোটের কিনার দিয়ে ডিঙিয়ে ককপিটে উঠল পাশা। ফ্রিজারের কাছে রাখল ওর মোটা কাপড়ের ব্যাগটা।

লম্বা সবুজ ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে বলল রসি পিন্টো, 'তৈরি হয়েই এসেছেন মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল পাশা। 'যেতে কতক্ষণ লাগবে আমাদের?'

উঠে দাঁড়াল পিন্টো। 'এই ঘণ্টাখানেক। রাতের বেলা খুঁজে বের করা কঠিন, আর মাত্র একবার গিয়েছি ওখানে, আপনাকে তো বলেছিই।'

'তা বলেছেন। আপনার মত একজনকে যে খুঁজে পাওয়া গেছে, আমাকে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছেন, এতেই আমি খুশি। কোন চার্টার বোটের মালিকই তো রাজি হলো না।'

'হ্যাঁ, কেন রাজি হয়নি, নিশ্চয় বুঝতে পারছেন,' বোটের নোঙর তুলতে এগোল পিন্টো। 'নাবিকরা অতিরিক্ত কুসংস্কারে বিশ্বাসী, আর ডোমিনিক আইল্যান্ডের কুখ্যাতি প্রচুর। ওটার চারপাশ ঘিরে ডুবোপাথরের ছড়াছড়ি। পানিতে গিজগিজ করে হাঙর। কেউ ওটার কাছে যেতে সাহস করে না।'

'আপনি ভয় পান না?' পাশা জিজ্ঞেস করল।

'টাকা পেলে, সেনিয়র পাশা, সব করতে রাজি আছি আমি। আর আপনি অনেক টাকা দিয়েছেন আমাকে।'

বোটের মালিকের পিছন পিছন মই বেয়ে ফ্লাইং ব্রিজে উঠে এল পাশা। একটা বেঞ্চে বসল। কন্ট্রোল কনসোলের দিকে মনোযোগ দিল পিন্টো।

'এখন একটা কথা আমার জানা দরকার, সেনিয়র,' বলল ও, 'আপনি ওখানে কেন যেতে চান, সেটা কিন্তু এখনও বলেননি আমাকে। কেন জানতে চাই, বুঝতে পারছেন নিশ্চয়–কোনও সমস্যা হলে আমাকেই তো সামাল দিতে হবে।'

'আমি ফেডারেল গভর্নমেন্টের কাজ করি,' পাশা বলল।

পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল পিন্টো। ভয় দেখা যাচ্ছে মুখে। 'কার কাজ করেন?'

'ফেডারেল গভর্নমেন্ট,' আবার বলল পাশা। 'ফ্লোরিডা কী-র সমস্ত দ্বীপে আদমশুমারি করছি।'

'আদমশুমারি?' ভুরু কুঁচকে পাশার কথার প্রতিধ্বনি করল যেন পিন্টো। পুরো পাঁচ সেকেণ্ড লাগল হজম করতে। তারপর হেসে উঠল। 'ও, বুঝেছি! আসলে বলতে চাইছেন দ্বীপশুমারি।' উরুতে চাপড় দিয়ে হা-হা করে হাসছে। 'নাহ্, আপনার রসবোধ আছে, সেনিয়র। যাকগে, ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছি আমি। নিজের বিষয় নয়, এমন কোন ব্যাপারে নাক গলায় না রসি পিন্টো।'

চাবিতে মোচড় দিল ও। চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন। বোটের পিছনে আলোড়ন তুলল প্রপেলার। নড়ে উঠল সি কুইন। বার্থ থেকে এগিয়ে চলল খোলা সাগরের দিকে। উল্টোদিক থেকে আসা আরেকটা বোটের মোটাসোটা একজন মানুষের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল পিন্টো, তারপর থ্রটল ধরে টান দিল। তাজী ঘোড়ার মত লাফিয়ে উঠে ছুটতে শুরু করল সি কুইন।

সাগরের পানির নোনা গন্ধ নাকে ঢুকল পাশার। ভাল লাগছে। ভারী দম নিয়ে তাজা বাতাসে ফুসফুস ভরে নিল। বোটের পাশে কিছুটা দূরে খেলাচ্ছলে লাফিয়ে উঠে পানিতে পড়ে আবার ডুবে গেল দুটো ছোট আকারের মাছ। মাথার ওপরে চক্কর দিয়ে উড়ছে কয়েকটা গাল, তাকিয়ে আছে টুকরো খাবারের আশায়।

'আহ্, এই তো জীবন, তাই না, সেনিয়র?' পিন্টো বলল। 'এই সাগর, এই সূর্য, পেট ভর্তি খাবার; আর কী প্রয়োজন একজন মানুষের বলুন তো?'

পিছনে হেলান দিল পাশা। দুই হাত পিছনে নিয়ে গিয়ে আঙুলে আঙুল ঢুকিয়ে তালুতে মাথা রাখল। আগামী দুটো ঘণ্টা পিন্টোর বকবক শুনতে তৈরি হলো। প্রচুর টাকা দিয়ে কিনেছে এই বকবকানি, কাজে লাগলে হয়।

সূত্র জোগাড়ের জন্য টাকা দিতে কার্পণ্য করেনি পাশা। পিন্টোর মতই টাকা ভালবাসে, এমন একজন বারটেন্ডারের কাছে টাকার বিনিময়ে জেনেছে, কী-ওয়েস্টের অপরাধ জগতে নাকি গুজব রয়েছে, ডোমিনিক আইল্যাণ্ডে ডুয়েরো মাদক পাচারের ঘাঁটি আছে। কীভাবে কাজটা করা হয়, কেউ জানে না। তবে বেশ কয়েকটা সূত্র থেকে পাশাকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে, দ্বীপটার কাছে যাওয়া আর নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া একই কথা–আত্মহত্যার সামিল।

রেডিও চালু করল পিন্টো। একটা স্টেশন ধরল যেটাতে স্প্যানিশ পপ মিউজিক বাজানো হচ্ছে। মাথা দুলিয়ে গুনগুন করতে লাগল ও, বাজনার তালে তালে চাপড় দিচ্ছে হুইলে।

সেদিন সকালেই স্টিফেন হান্টারকে ফোন করে পিন্টোর সম্পর্কে যা

যা জানে, জানাতে অনুরোধ করেছিল পাশা। জানিয়েছে হান্টার। রেকর্ড বলছে, সারাটা জীবনই দক্ষিণ ফ্লোরিডায় কাটিয়েছে লোকটা। অনেক লম্বা রেকর্ড। বহুবার গ্রেপ্তার হয়েছে পুলিশের হাতে, সবই ছোটখাট অপরাধের জন্য, এই যেমনঃ চুরি, জালিয়াতি, মাতলামি আর আইন না মানা। বছর তিনেক আগে কী-ওয়েস্টে চলে এসেছে, তারপর থেকে আর একটা অপরাধও করেনি, অর্থাৎ পুলিশের রেকর্ডে নেই। তারমানে হয় লোকটা ভাল হয়ে গেছে, নয়তো পুলিশের নজর এড়িয়ে অতি সাবধানে নিজের কুকর্মগুলো করে চলেছে।

কথা বলার মেজাজে রয়েছে পিন্টো। 'আপনি কি জানেন, সেনিয়র, একটা সময় জলদস্যুদের দখলে ছিল এখানকার সাগর? মাঝে মাঝেই কেউ না কেউ সেসব পুরানো জাহাজ পানির নীচ থেকে খুঁজে বের করে এখন, কোন কোনটাতে গুপ্তধনও পেয়ে যায়।' লোভীর দৃষ্টিতে মেক্সিকো উপসাগরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইস্, ওরকম একটা জাহাজ যদি আমি পেয়ে যেতাম!'

'পেলে কী করতেন?' একেবারে চুপচাপ থাকার চেয়ে কথা বলে সময় কাটানোর জন্য জিজ্ঞেস করল পাশা।

'আবার রসিকতা করছেন না তো?' এমনভাবে ঠোঁট দিয়ে শব্দ করল পিন্টো, যেন লোভনীয় খাবার দেখেছে। 'পেলে কী করতাম? দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে চিলি, বলিভিয়া কিংবা ব্রাজিলে রাজার হালে কাল কাটাতাম। দামি দামি কাপড় পরতাম, দামি গাড়ি চালাতাম। স্বর্গে বাস করতাম।'

'দক্ষিণ আমেরিকায় গেছেন কখনও?'

'সি, সেনিয়র। কলাম্বিয়ায় তিনবার গেছি...' বলেই থেমে গেল

পিন্টো। সতর্ক চোখে পাশার দিকে তাকাল। 'কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

শ্রাগ করল পাশা। 'কোন কারণ নেই।' এক মুহূর্ত থেমে জিজ্ঞেস করল, 'কলাম্বিয়ায় এতবার গেলেন, ওখানে থেকে গেলেন না কেন? আমিও শুনেছি, দেশটা নাকি চমৎকার।'

'বেড়ানোর জন্য ভালই। কিন্তু যে পরিমাণ খুনখারাবি হয়, নিশ্চয় শুনেছেন? মাদকসম্রাটরা নিজেদের ইচ্ছেমত চলে ওখানে, যা খুশি করে বেড়ায়। কিছু কিছু পুলিশ তো ওখানে গুণ্ডাদের চেয়ে খারাপ। তার ওপর রয়েছে পলিটিশনদের অত্যাচার। যে কোন সময় ওদের খুনে গুণ্ডাবাহিনী মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়, কেউ কিছু বলতে পারে না।' হাত নাড়ল পিন্টো। 'না, সেনিয়র, আমার কোটি কোটি টাকার গুপ্তধন নিয়ে এমন জায়গায় বাস করতে চাই, যেখানে আইনের শাসন আছে।'

এমন একজন মানুষের মুখ দিয়ে এরকম দার্শনিক উক্তি বেরোল, যে একজন পুলিশ অফিসারের ওপর হামলা চালানোর অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছিল, মাত্রাতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানোর জন্য ওকে জরিমানা করেছিল অফিসারটি। পিন্টোর কলাম্বিয়া যাওয়ার ঘটনাটা আগ্রহী করে তুলল পাশাকে। ওখান থেকেই কোকেইনের বড় বড় চালানগুলো আসে। তার সন্দেহ, মুখে যত বড় বড় কথাই বলুক, এই লোকটাও মাদক পাচারের সঙ্গে কোন না কোনভাবে জড়িত।

একটা ম্যাপ দেখে কোর্স বদল করল পিন্টো। পূর্ব দিকে চলল।

স্বাভাবিক নৌপথ থেকে অনেকটাই দূরে ডোমিনিক আইল্যাণ্ড। এতটাই দূরে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হোক বা না হোক, সাধারণত ওটার কাছাকাছি কারোর যেতে হয় না। নামটা জানার পর ম্যাপে ভাল

করে দেখে নিয়েছে পাশা। গ্রেট হোয়াইট হিরন ন্যাশনাল ওয়াইল্ডলাইফ রেফিউজের সীমান্তে। আকারে ছোট, চৌহদ্দি বড়জোর দুই একর, দেখতে অনেকটা অশ্রুফোঁটার মত, আর এগোতে হয় উত্তর দিক থেকে–রিফ বা ডুবো শৈলশিরা এড়ানোর জন্য। খুব তাড়াতাড়িই সূর্যটাকে গিলে ফেলল যেন সাগর। গোধূলির আলো অদ্ভুত রঙের আভা সৃষ্টি করল। একটা দুটো করে তারা ফুটল আকাশে। এক সময় দেখা গেল তারায় তারায় ভরে গেছে পুরো আকাশটা। গোধূলির আলো মিলিয়ে গেল। শুধু যন্ত্রের ওপর নির্ভর করে বোট চালাচ্ছে পিন্টো। বোটের শক্তিশালী টুইন ইঞ্জিন দুটো একটানা গরগর করে চলেছে যেন তৃপ্ত বিড়ালের বাচ্চার মত।

একটানা অনেকক্ষণ বসে থেকেছে, তাই সামান্য পা নাড়ানোর কথা বলে, মই বেয়ে নিচে নামল পাশা। ককপিটে পায়চারি করল কিছুক্ষণ। তারপর ফাইটিং চেয়ারটায় বসল।

আসলে, বোঝার চেষ্টা করছে, ওদের অনুসরণ করা হচ্ছে কি না। পাশা যে বোট ভাড়া করেছে, এব্রো ডুয়েরো জেনে যাবেই। আগে হোক পরে হোক, আরেকবার ওকে শেষ করে দেয়ার জন্য হামলা চালাবে, জানা কথা।

বিশ মিনিট ধরে তীক্ষ্ণ নজর রেখেও আর কোন বোটের অস্তিত্ব টের পেল না পাশা। কিন্তু একেবারেই নেই, এটাও মেনে নিতে পারল না। রেডার থাকলে অনেক দূর থেকেও বোট নিয়ে ওদের অনুসরণ করতে পারবে।

পিন্টো বলেছে পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক লাগবে। কী-ওয়েস্ট ছাড়ার ঠিক এক ঘণ্টা চার মিনিট পর থ্রটল ঠেলে দিয়ে ঘোষণা করল ও,

'কাছে চলে এসেছি আমরা, সেনিয়র পাশা।'

ফ্লাইং ব্রিজে উঠে এল আবার পাশা। সামনের অন্ধকারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পিন্টো।

'কতটা কাছে?' পাশা জিজ্ঞেস করল।

একটা স্পটলাইট জ্বেলে দিলে পিন্টো। অন্ধকারের চাদর ফুঁড়ে বেরোল যেন তীব্র সাদা আলোর রশ্মি। আলোর শেষ মাথায়, অস্পষ্টভাবে দেখা গেল ঘন কালো রঙের একটা বিশাল বস্তু যেন পানিতে পিঠ ভাসিয়ে রয়েছে।

'আপনার প্রশ্নের জবাব পেলেন?' হুইল অনেকখানি ঘুরিয়ে দিয়ে পিন্টো বলল, 'উত্তর ধার ঘুরে যাব। তাহলে হয়তো কিনারে ভিড়তে পারব। ডুবো পাথরের দিকে নজর রাখবেন, সেনিয়র।'

সেফটি রেইলে উঠে এল পাশা। পানিতে স্পটলাইটের আলো ফেলেছে পিন্টো। সেদিকে তাকিয়ে রইল ও। পানির নিচে কালো একটা বড় জিনিস চোখে পড়ল। সামনে ডানদিকে হাত তুলে দেখাল, 'ওদিকে আছে একটা।'

'সর্বনাশ!'

গতি কমিয়ে দিল পিন্টো। সাঁই-সাঁই করে বাঁয়ে কাটল স্টিয়ারিং। অল্পের জন্য লাগল না ডুবোপাহাড়ের গায়ে।

পাশার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, হিসেবে ভুল করেছে পিন্টো। দেরি করে বোটের নাক ঘুরিয়েছে, আরও আগেই উত্তরে মোড় নেয়া উচিত ছিল ওর। মারাত্মক বিপদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এখন। যে কোন মুহূর্তে পানির নীচের ধারাল পাথরে লেগে তলা ফুটো হয়ে কিংবা চিরে গিয়ে ডুবে যেতে পারে বোট।

আরেকটা শৈলশিরাকে মাথা তুলতে দেখল পাশা, এবার বাঁয়ে।

পাগলের মত হুইল ঘুরিয়ে চলেছে পিন্টো। প্রচণ্ড ঘষার শব্দ শুনে ভাল করে দেখার জন্য রেলিঙের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে নিচে তাকাল পাশা। কাঁটাঝোপের মত দেখতে প্রবালের গায়ে ঘষা খেয়ে রঙ উঠে গেছে বোটের তলার, তবে আঁচড় লেগেছে শুধু, গভীরভাবে বসে গিয়ে চিরে ফাঁক হয়ে যায়নি।

'আরও আস্তে চালান,' পাশা বলল।

ফ্যাকাশে হয়ে গেছে পিন্টোর মুখ। 'আর বলতে হবে না,' এমনভাবে হুইল ঘোরাচ্ছে, যেন চিনামাটির অতি ঠুনকো জিনিস, জোরে চাপ লাগলেই ভেঙে যাবে। বিড়বিড় করে বলল কিছু, বোধহয় নিজেকেই গালি দিল, তারপর পাশাকে শুনিয়ে বলল, 'আপনার কাছ থেকে আরও বেশি টাকা নেয়া উচিত ছিল, সেনিয়র। এখানে বোট ডোবালে ইনসিওরেন্স কোম্পানি টাকা দেবে না।'

'ডুববে না,' পিন্টোর আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য বলল পাশা। বোটের কাণ্ডারি এখন ভড়কে গেলে বিপদ এড়ানো অসম্ভব হবে, দুজনের কেউই সেটা চায় না।

নিরাপদেই শৈলশিরাটা পেরিয়ে এল সি কুইন। এঁকেবেঁকে পেরিয়ে এল আরও কয়েকটা পাহাড়ের শিরা। আরও কয়েকশো ফুট এগোনোর পরও যখন আর কোন ডুবোপাহাড় চোখে পড়ল না, পূর্ব দিকে বোটের মুখ ঘোরাল পিন্টো। অল্প কিছুদূর এগিয়ে দক্ষিণমুখো হয়ে এগোল।

উদ্বেগ সামান্য কমেছে পাশার। উত্তর দিক থেকে দ্বীপের দিকে এগোচ্ছে এখন বোট, যা ওরা চেয়েছিল। কনসোলের কাছে এসে দাঁড়াল ও। 'আলোটা এখন তীরে ফেলুন।'

আলো ঘোরাল পিন্টো। দ্বীপের কিনারে ফেলল। ফিতের মত এক

চিলতে পাথুরে সৈকতের ওপাশে বেড়া তৈরি করে রেখেছে যেন গাছপালা।

কিছুটা অবাকই হলো পাশা। জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। ও ভেবেছিল শুধু চ্যাপ্টা, রুক্ষ পাথরের শিরা দেখবে। যাক, ভালই হলো। জঙ্গল থাকায় হামলা এলে লুকাতে পারবে, পাল্টা আক্রমণ সহজ হবে।

'এখন কী করব, সেনিয়র?' পিন্টো জিজ্ঞেস করল। 'আপনি বলেছিলেন, এখানে নিয়ে আসতে। এনেছি। আর কী করব?'

মাথা নেড়ে তীরের দিকে ইঙ্গিত করল পাশা। 'ওখানে নামিয়ে দিয়ে চলে যান। তিন দিন পর ফিরে এসে নিয়ে যাবেন আমাকে।'

অবাক হলো পিন্টো। সেটা চেপে রাখতে পারল না। 'সত্যি বলছেন! জায়গাটা খারাপ। সাপ আর বিষাক্ত পোকামাকড় আছে ওখানে।'

'আপনি জানলেন কী করে? আমি তো ভেবেছিলাম, আপনি নামেনইনি ওই দ্বীপে।'

কাঁধ বাঁকাল পিন্টো। 'না, নেমেছি, আপনার কাছে অস্বীকার করব না। ওখানে পানি নেই। খাবারও পাবেন না। বোকামি করে মরার চেয়ে, ওসব দুর্বুদ্ধি বাদ দিয়ে, আমার সঙ্গে ফিরে চলুন।'

মই বেয়ে নামতে শুরু করেছে ততক্ষণে পাশা। 'ডাঙার যতটা সম্ভব কাছে নিয়ে যান।' মইয়ের তৃতীয় ধাপটা থেকে লাফিয়ে নামল ও। বোটের কিনারে এসে দাঁড়াল। আকাশের অগণিত তারার আলো ছাড়া আর কোন আলো নেই কোথাও। ভাবছে, পিন্টো কি ওর কথা শুনবে? না শুনলে কোনরকম তথ্য ছাড়াই এখান থেকে বিদেয় হতে হবে পাশাকে কোন লাভ হবে না।

বোটের মুখ সাগরের দিকে ঘুরিয়ে দিল পিন্টো। তারপর ইঞ্চি ইঞ্চি

করে পিছিয়ে নিয়ে চলল তীরের দিকে। এদিকে সম্ভবত কোন ডুবোপাহাড় নেই, তবু ঝুঁকি নিল না ও। তীরের কাছ থেকে ছয় ফুট দূরে থাকতে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। নোঙর ফেলে বলল, 'ডাঙায় পৌঁছতে আপনাকে সাহায্য করি, সেনিয়র।'

'লাগবে না।'

'লাগবে।' ধাপ বেয়ে না নেমে, মইয়ের দু'পাশের মসৃণ রেইল ধরে পিছলে নেমে এল পিন্টো। চওড়া হাসি হেসে, নিচু হয়ে পাশার ব্যাগের একটা ফিতে চেপে ধরল। 'আপনি আমার বোট ভাড়া করেছেন, কাজেই যতক্ষণ আমার এখানে থাকছেন, আপনার সব দায়দায়িত্ব আমার, তাই না? আপনার যাতে কোনরকম ক্ষতি না হয়, সেটা তো দেখতেই হবে আমাকে।'

'আমার দায়িত্ব আমি নিজেই নিতে পারব,' পাশা বলল।

ব্যাগটা তোলার জন্য ফিতে ধরে টান দিয়েই থেমে গেল পিন্টো। 'উহ্, কী ভরেছেন এর মধ্যে? এ তো এক টনের কম হবে না!' দুই হাতে টেনে ব্যাগটা উঁচু করল ও, ধীরে ধীরে এগোল পাশার দিকে। 'আপনার গায়ে ভীষণ জোর, সেনিয়র। এক হাতেই বয়ে নিয়ে এসেছিলেন এটা, আমি দেখেছি।'

জেনেশুনেই নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়েছে পাশা, ডোমিনিক আইল্যান্ডে এসেছে। ও সন্দেহ করেছিল, পিন্টোই কী-ওয়েস্টে ডুয়েরোকে ওর কথা জানিয়ে সাবধান করে দিয়েছে। বারটেন্ডারের কাছে পাশা জেনেছে, গুজব রয়েছে মাঝে মাঝে নাকি পিন্টো মাদক পাচারে ডুয়েরোকে সাহায্য করে। আর ডোমিনিক আইল্যান্ড হলো মাদক হাতবদল করার ঘাঁটি।

আর এ কারণেই পিন্টোর কাছে ভোট ভাড়া করতে গিয়েছিল পাশা।

ও ভেবেছিল, পিন্টো ওর বসকে গিয়ে বলবে, আগামী দিন বিকেলে একজন অচেনা লোক এসে আমাকে ডোমিনিক আইল্যান্ডে নিয়ে যেতে বলেছে। তাতে–পাশা আশা করেছিল–গোপন আবাস থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসবে ডুয়েরো, ওর মুখোমুখি হবে। কিন্তু তার বদলে হ্যাসি আর টনিকে ওর পিছনে লেলিয়ে দিল ডুয়েরো।

পাশা দেখল, ককপিট পেরিয়েছে পিন্টো। উত্তেজিত হয়ে আছে পাশা, টান টান স্নায়ু, যে কোন অঘটনের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তৈরি থেকেও পুরোপুরি সামলাতে পারল না পরিস্থিতি। আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে লক্ষ্য করে ভারী ব্যাগটা ঘুরিয়ে বাড়ি মারল পিন্টো। একপাশে সরে যেতে চাইল পাশা, কিন্তু তার আগেই ওর বুকে এসে লাগল ব্যাগটা, ওকে চিত করে ফেলে দিল একটা বরগার ওপর। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আগেই ওর গায়ের ওপর এসে পড়ল পিন্টো, তারার আলোয় ম্লানভাবে ঝিলিক দিয়ে উঠল একটা বাটারফ্লাই নাইফের ফলা।

পাশার গলায় পোঁচ মারার চেষ্টা করল পিন্টো। কিন্তু ফলাটা লাগার আগেই মাথা নিচু করে ফেলল পাশা, লাথি মেরে পিছনে সরিয়ে দিল পিন্টোকে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ পেল। জ্যাকেটের ভিতর হাত ঢোকাল বেরেটাটার জন্য। ওর আঙুল সবে পিস্তলের বাট ছুঁয়েছে, এ সময় চিৎকার দিয়ে সামনে ছুটে এল পিন্টো, মরিয়া হয়ে ছুরির ফলাটা এপাশ ওপাশ করে পাশার গায়ে লাগাতে চাইল। এত বেশি নড়াচ্ছে, নেহাত ভাগ্যক্রমেই থাবা দিয়ে ওর ছুরি ধরা হাতটা ধরে ফেলতে পারল পাশা।

থামার কোনও লক্ষণ নেই পিন্টোর। খেপা ষাঁড়ের মত হামলা চালাল পাশার ওপর। ওকে ঠেলে নিয়ে চলল বোটের কিনারে।

বোটের গলুইয়ের কিনার ডিঙিয়ে পানিতে পড়ে গেল দুজনে।
কিছুতেই পিন্টোর ছুরি ধরা হাতটা ছাড়ল না পাশা। ঠাণ্ডা পানিতে ডুবে গেল দুজনে। নোনা পানি জ্বালা ধরাল পাশার চোখে।
কোমর পানিতে পড়েছে ওরা। সোজা হয়ে দাঁড়াল পাশা। টেনে তুলল পিন্টোকে। মুক্ত হাতটা দিয়ে পাগলের মত ঘুষি মেরে চলল লোকটা। একটা ঘুষি লাগল পাশার গালে, আরেকটা চাঁদি ঘেঁষে চলে গেল।
ভয়ানক ধস্তাধস্তি করতে করতে একে অন্যকে বাগে পেতে চাইছে। মারামারি করতে জানে না পিন্টো। বক্সারও নয়, মার্শাল আর্টেরও ট্রেনিং নেই। গায়ের জোরে মরিয়া হয়ে প্রতিপক্ষকে কাবু করার চেষ্টা করছে। তাতে পাশার জন্য আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে গেছে ও।
পায়ের নীচে পিচ্ছিল পাথর। একবার পা পিছলে আরেকটু হলেই চিত হয়ে পড়ছিল পাশা। সুযোগটা কাজে লাগিয়ে ছুরি দিয়ে পাশার গলা কাটার চেষ্টা করল পিন্টো। দুই হাতে ওর কব্জি চেপে ধরে প্রাণপণে ফলাটা গলার কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছে পাশা।
জলাতঙ্কে আক্রান্ত নেকড়ের মত ধক্ ধক্ করে জ্বলছে পিন্টোর চোখ। পাশার কলার ধরে মাথাটা ঠেসে ধরল পানির নীচে। পাশার নাকে-মুখে পানি ঢুকে গেল, চোখের ওপর পানি, কয়েকটা সেকেণ্ড শত্রুকে দেখতে পেল না। তবে যত কিছুই ঘটুক, পিন্টোর ছুরি ধরা হাতটা ছাড়ল না।
উঠে দাঁড়াচ্ছে পাশা, এ সময় তীক্ষ্ণ খোঁচা লাগল বাঁ কাঁধে। ভুল করেছে ও। পাশা পানির নিচে থাকার সময়ই সুযোগ পেয়ে ছুরিটা হাত বদল করে ফেলেছে পিন্টো। ধারাল ফলাটা সামান্য ছুঁয়ে গেছে

শুধু পাশার কাঁধ, তাড়াহুড়োয় ভালমত পোঁচ দেয়ার সময় পায়নি পিন্টো।

জুডোর প্যাঁচ কষে পিন্টোকে মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল পাশা। বুদবুদে ভরা তীরের অল্প পানিতে গিয়ে বস্তার মত আছড়ে পড়ল পিন্টো। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল।

পানি ভেঙে ওর কাছে পৌঁছে গেল পাশা। সামলে নিয়েছে পিন্টো। তবে আর মারামারি করতে এল না, বুঝে গেছে পাশার সঙ্গে পারবে না। আচমকা বাঁয়ে ঘুরে, এক দৌড়ে পাথুরে সৈকত পেরিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল বনের মধ্যে।

'তোমাকে আমরা ছাড়ব না, গ্রিংগো, দেখে নিয়ো!' গাছপালার আড়াল থেকে চিৎকার করে বলল পিন্টো। পাশা বুঝল, ওকে আমেরিকান ভেবেছে, সেজন্যই 'গ্রিংগো' বলছে।

ওর দিকে কয়েক কদম ছুটে গেল পাশা। তারপর, এভাবে পিছু নেয়াটা ঠিক হবে না বুঝে থেমে দাঁড়াল। পিস্তলটা বের করে নিয়ে পিছিয়ে গেল পানিতে। বোটের কাছে এসে কিনার ধরে ঝুলে পড়ল। ওপরে টেনে তুলল নিজেকে। পিন্টো পালিয়েছে। বোটটাকে নিয়ে এখন যা ইচ্ছে করতে পারে পাশা।

ব্যাগের পাশে বসে ওটার মুখ খুলল ও। প্রথমে বের করল একটা খাপে ভরা ডেজার্ট ঈগল পিস্তল, ডান উরুতে বাঁধল খাপের ফিতে। তারপর বের করল একটা এম-১৬ কারবাইন, ব্যাগে ভরার সুবিধের জন্য নল, বাট, এগুলো আলাদা করে খুলে রেখে দিয়েছিল।

দ্রুত হাত চালাল ও। জোড়া দিয়ে ফেলল রাইফেলটা। ত্রিশ রাউন্ডের একটা ম্যাগাজিন লাগিয়ে পায়ের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখল অস্ত্রটা। তারপর ব্যাগ থেকে আরও কিছু মারাত্মক অস্ত্র বের করল।

যেমন, একটা কা-বার ফাইটিং নাইফ। ডান গোড়ালির সামান্য ওপরে ওটার খাপের ফিতে বাঁধল ও। ব্যাগের মুখ আবার বন্ধ করে রেখে উঠে দাঁড়াল।

ব্যঙ্গভরা হাসি শোনা গেল দ্বীপের দিক থেকে। রাইফেলটা হাতে তুলে নিল পাশা। অন্ধকার জঙ্গলের দিকে তাকাল। কালো দেয়ালের মত লাগছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না তার ভিতরে। যদ্দুর জানে, পিন্টোর কাছে শুধু একটা ছুরি আছে। কিন্তু এই দ্বীপে যদি নিয়মিত যাতায়াত থাকে ওর, তাহলে নিশ্চয় খাবারদাবার, অস্ত্র আর টিকে থাকার অন্যান্য রসদ রেখেছে।

ফ্লাইং ব্রিজে উঠল পাশা। কনসোলে পা দিয়েছে, এ সময় আবার শোনা গেল ব্যঙ্গভরা হাসি। কাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে, খুব মজা পাচ্ছে পিন্টো।

'চালাও, সেনিয়র! পারলে স্টার্ট দাও! কিছুই করতে পারবে না!'

পাশার ইচ্ছে, তীর থেকে সামান্য সরে গিয়ে বোট থামিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে, আর কোন বোট আছে কি না দেখার জন্য। কিন্তু যতই সুইচ টিপল, কাজ হলো না, সাড়া দিল না ইঞ্জিন। সার্কিটে কোন কারসাজি করে রাখা হয়েছে, যেটা জানে শুধু পিন্টো, আর সে-ই শুধু সেটা স্বাভাবিক করে স্টার্ট দিতে পারে। এ ধরনের কারসাজি নতুন নয় পাশার কাছে। ভাবছে ও। আরেকটা বোতাম কিংবা ট্রিগার রয়েছে বোটের কোথাও, স্টার্টার টেপার আগে ওটা টিপে লাইন 'অন' করে নিতে হবে। কিন্তু ওটা খুঁজে বের করতে কতক্ষণ লাগবে, জানা নেই পাশার–হয়তো এক ঘণ্টা কিংবা তার বেশিও। কিন্তু বুঝতে পারছে, এত সময় নেই ওর হাতে।

'কী বলেছিলাম?' চেঁচিয়ে বলল পিন্টো। 'এক কাজ করো। পানিতে

নেমে ধাক্কা দিয়ে স্টার্ট করার চেষ্টা করো!'

স্পটলাইটের কন্ট্রোল চেপে ধরে রশ্মিটা তীরের দিকে ঘুরিয়ে দিল পাশা। তীরের গাছপালার দেয়ালের ডান দিক থেকে বাঁ দিকে সরিয়ে আনল একবার আলোটা। পিন্টোকে দেখল না। শুধু একটা ঝোপের ভিতর খুব সামান্য নড়াচড়া চোখে পড়ল। আলোটা ঠিক ওইখানেই স্থির করে রেখে নিচে নেমে এল ও।

ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নেমে এল বোট থেকে। পানি ভেঙে সাবধানে তীরের দিকে এগোল। আলোটা যেখানে ফেলেছে, সেদিকে চোখ। আশা করল, ওর চোখে পড়ার ভয়ে আলোর মধ্যে নড়াচড়া করবে না পিন্টো, বেরোনোর কিংবা যেখানে আছে সেখান থেকে সরার চেষ্টা করবে না।

গরম আবহাওয়া। তাই ভিজে চুপচুপে হয়ে গিয়েও ঠাণ্ডায় কষ্ট পেতে হলো না পাশাকে। ডাঙায় উঠে, ঝুঁকে বসে, ভালমত চোখ বোলাল একবার ছোট্ট সৈকতটায়, তারপর এক ছুটে ঢুকে পড়ল জঙ্গলের ভিতর। একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। কান পেতে আছে শব্দ শোনার আশায়। স্বাভাবিকভাবে পোকামাকড়ের কর্কশ তীক্ষ্ণ চিৎকার, আর ব্যাঙের ডাক শোনার কথা। কিন্তু নিশ্চুপ হয়ে আছে দ্বীপটা, যেন এক মৃত্যুপুরী। সামান্যতম শব্দ নেই কোথাও।

চার

'আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি!' পশ্চিম দিক থেকে চেঁচিয়ে বলল পিন্টো। 'তুমি ভেবেছ, তুমি খুব চালাক, আসলে তা নও!'

বনের আরও গভীরে ঢুকল পাশা। এত ঘন, ভাবছে, ভোজালি আনলে ভাল হতো।

'কি, শুনতে পাচ্ছ আমাকে, সেনিয়র পাশা?' আবার চিৎকার করল পিন্টো। 'মনে মনে তোমার স্রষ্টাকে ডাকো, মাই ফ্রেণ্ড, কারণ আর বেশিক্ষণ এই পৃথিবীতে থাকবে না তুমি। এব্রো ডুয়েরোর পিছনে লেগেছিলে, কিন্তু দাবার দান উল্টে দিয়েছে ও। ক্রমেই ফাঁদে আটকে যাচ্ছ তুমি। শীঘ্রি মারা যাবে। খুব শীঘ্রি!'

শুনতে ভাল লাগল না পাশার। বড় বেশি আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে পিন্টোকে। কেন? কেউ কি সাহায্য করতে আসছে ওকে?

ইতিমধ্যেই সশস্ত্র ভাড়াটে গুণ্ডাদের দ্বীপে পাঠিয়ে দেয়নি তো ডুয়েরো?

নিঃশব্দে বনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল পাশা। ভীষণ সতর্ক। এম-১৬ রাইফেলের সিলেক্টর লিভার ঘুরিয়ে 'অটো' থেকে 'সেমি'-তে নিয়ে এল ও। দেখে গুলি করতে হবে এখানে, টানা গুলি করে জঙ্গল ছিন্নভিন্ন করে দেয়ার প্রয়োজন নেই।

কথা বলা থামিয়ে দিয়েছে পিন্টো। মট করে একটা ডাল ভাঙার শব্দ কানে এল পাশার।

রাইফেল উঁচু করল পাশা। কিন্তু লোকটা ঠিক কোথায় আছে, বুঝতে পারল না। পশ্চিমে এগিয়ে এক টুকরো লম্বা ঘাসের চাপড়ার মধ্যে চলে এল ও। উপুড় হয়ে শুয়ে বুকে হেঁটে এগিয়ে চলল, ঘাসের ডগাকে যতটা সম্ভব কম নাড়িয়ে। হঠাৎ সামনে একটা পায়েচলা পথ খুলে গেল, উত্তর থেকে দক্ষিণে গেছে। থেমে গিয়ে দু'পাশ দেখল ও।

পানিতে পড়ার শব্দ কানে এল সি কুইনের দিক থেকে। পাশা অনুমান করল, বোটে ফিরে যাচ্ছে পিন্টো। উঠতে গেল ও, তারপর জমে গেল বরফের মত, ডান পা বেয়ে পিছলে সরে যাচ্ছে কী যেন। আস্তে করে ঘাড় ঘুরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল ও।

বড় একটা সাপ। পাশার নড়াচড়া টের পেয়ে থেমে গিয়ে ফণা তুলেছে। অন্ধকারে শুধু ওটার সর্পিল দেহটার অবয়ব অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও, আর চেরা জিভটার ঘন ঘন ঢোকা-বেরোনো, মাথাটা এপাশ-ওপাশ করে বাতাসে বোধহয় বিপদের অস্তিত্ব খুঁজছে।

কী ধরনের সাপ, বুঝতে পারছে না পাশা। জানে না, ফ্লোরিডার এ

সব দ্বীপে কোরাল কিংবা কটনমাউথের মত বিষাক্ত সাপ আছে কি না। কিছুদিন আগে একটা গুজব শুনেছে, দক্ষিণ ফ্লোরিডার বনে নাকি গোখরো সাপও দেখা গেছে। কোন এক বোকা লোক কিছু গোখরো সাপ পুষতে এনে কিছুদিন পর শখ মিটে যাওয়ায় সেগুলো নাকি বনের ভিতর ছেড়ে দিয়েছে। ক্রমশ বংশ বৃদ্ধি করছে সেই সাপগুলো, তার প্রমাণও নাকি পাওয়া গেছে।

যাই হোক, ক্রুদ্ধ ফোঁসফোঁস শব্দ করে পাশার পা বেয়ে কয়েক ইঞ্চি ওপরে উঠে এল সাপটা। তারার ফ্যাকাশে আলোয় ওটার তির্যক চোখ দুটোকে কেমন পৈশাচিক মনে হচ্ছে, যেন ভিতরের আগুন চোখ দিয়ে ফুটে বেরোচ্ছে। দুলতে শুরু করল ভয়ঙ্কর প্রাণীটা। পাশার কাঁধের কাছে এসে মাথা নামাতে লাগল। কামড় খাওয়ার ভয়ে আপনাআপনি কাঁধের পেশি শক্ত হয়ে গেল পাশার। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ওকে নিরীহ ভেবে আচমকা পাশ কেটে গা থেকে নেমে পড়ল, হারিয়ে গেল উঁচু ঘাসের ভিতরে।

রাস্তাটা ধরে দক্ষিণে এগোল পাশা। তিরিশ গজ মত এসে, বড় একটা গাছের নীচে থামল। মোটা কাণ্ডটার মাথায় গাঁটওয়ালা বড় বড় ডালের দিকে তাকাল। জায়গাটা সুবিধেজনক মনে হওয়ায় ব্যাগটা নামিয়ে রাখল মাটিতে। এম-১৬ রাইফেলটা ঝুলিয়ে নিল বাঁ কাঁধে। গাছ বেয়ে প্রথমে সবচেয়ে নীচের ডালটায় উঠল। সেটা থেকে এ-ডাল ওডাল করতে করতে উঠে এল মগডালে, মাটি থেকে অন্তত তিরিশ ফুট ওপরে।

সাগরের দিকে তাকাল। সি কুইন চলে যায়নি, বরং আরেকটা বোট এসে নোঙর ফেলেছে ওটার পাশে। অস্পষ্ট মূর্তিরা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। দ্বিতীয় বোটটার ফ্লাইং ব্রিজে দাঁড়ানো গাট্টাগোট্টা একজন

লোক। চেঁচিয়ে হুকুমের পর হুকুম দিয়ে চলেছে। নিশ্চয় ডুয়েরো। তাকিয়ে আছে পাশা। আধ ডজন কালো পোশাক পরা মূর্তি নেমে এল ডুয়েরোর বোটের পিছন দিয়ে, তীরে উঠল। ছড়িয়ে গিয়ে বনে ঢুকল।

কাজ করেছে পাশার পরিকল্পনা। গোপন আস্তানা থেকে বের করে এনেছে ডুয়েরোকে, কিন্তু প্রচণ্ড ঝুঁকির বিনিময়ে। ডুয়েরোর সশস্ত্র খুনে বাহিনীর ছয়জন লোক এখন আটোম্যাটিক অস্ত্র নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে পাশাকে। নিশ্চয় ওরা এর আগেও দ্বীপটাতে এসেছে, ভাল করে চেনে, এর কোথায় কী আছে জানে। তাই এখানে চলাফেরা করা ওদের জন্য সুবিধেজনক, পাশার চেয়ে।

যতটা সম্ভব পাতা না নড়িয়ে, ডাল থেকে ডালে নেমে এল পাশা। ছয় ফুট ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল মাটিতে, নিঃশব্দে। ব্যাগটা তুলে নিয়ে প্রায় দৌড়ে চলল দক্ষিণে। কোথাও না কোথাও গিয়ে শেষ হয়েছে এই পথ। কোথায়, সেটা জানতে চায় ও। আরও একশো গজ সামনে এগিয়ে পাতলা হয়ে এল বন। তার ওপাশে খোলা জায়গা।

এম-১৬টা কাঁধ থেকে খুলে নিল ও। নলের মুখটা এপাশ ওপাশ নড়াতে নড়াতে এগিয়ে চলল সামনের একটা ছোট কুঁড়ের দিকে। ওটার পাশে একটা অদ্ভুত ঢিপি চোখে পড়ছে। কাছে এসে বোঝা গেল, পানি নিরোধক তেরপল দিয়ে চারটে বাক্স ঢেকে রাখা হয়েছে। পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ বের করে বাক্সগুলোতে কী আছে দেখল ও। তিনটেতে অস্ত্র আর গুলি, চতুর্থটাতে খাবার।

তক্তা দিয়ে বানানো হয়েছে কুঁড়েটা। দরজার পাল্লা নেই, সেখানে একটা কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। রাইফেলের মাথা দিয়ে

কাপড়ের একপাশ সরিয়ে ঘরের ভিতরে টর্চের আলো ফেলল পাশা। একবার তাকিয়েই নাক কোঁচকাল ও। ঠুনকো দেয়ালে কাত করে রাখা ভাঙা চারপায়া, এক কোণে একটা মরচে পড়া কেরোসিনের স্টোভ। খালি, ফেলে দেয়া টিনের ক্যান, উয়িস্কির বোতল আর দোমড়ানো বিয়ারের ক্যান, এঁটো মুরগির হাড় ছড়িয়ে আছে মাটিতে। ভয়াবহ নোংরা।

পুরো ধুলোর আস্তর বুঝিয়ে দিল, বহুকাল ব্যবহার করা হয় না জায়গাটা। কোন কারণে যদি মাদক-কারবারিদের কারও দ্বীপে থাকার প্রয়োজন পড়ে, সেজন্য কুঁড়েটা বানানো হয়েছে। তবে থাকা হয় নিশ্চয় কালেভদ্রে।

প্যান্টের এক পকেট থেকে একটা এম-৬৭ ফ্র্যাগমেনটেশন গ্রিনেড বের করল পাশা। আরেক পকেট থেকে বের করল এক বান্ডিল সরু তার। হাঁটু গেড়ে বসে, দরজার ঠিক ভিতরে, বাঁ পাশে ছোট একটা গর্ত করল, তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিল গ্রিনেডটা। তারের এক মাথা গ্রিনেডের সেফটি পিনের পুল রিঙের ভিতরে ঢুকিয়ে শক্ত করে আটকে দিল। মাটির গোড়ালি সমান উঁচু দিয়ে তারটা টেনে দরজার পাশের একটা পেরেকের মাথায় ভালমত পেঁচাল। কা-বার নাইফ দিয়ে ওখান থেকে বাকি তারটুকু কেটে বান্ডিলটা পকেটে রেখে দিল।

উত্তেজিত ডাক ছেড়ে বনের ভিতর থেকে উড়ে গেল একটা পাখি। ওটার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে কেউ, সেটা মানুষও হতে পারে, কিংবা অন্য কিছু।

কুঁড়ের কাছ থেকে দ্রুত সরে এসে পুবের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল পাশা। ব্যাগটা রাখার একটা উপযোগী জায়গা খুঁজল। একটা গাছের

গোড়ার খোড়ল দেখে সেটাতে ঢুকিয়ে রাখল।

পুবমুখো এগিয়ে চলল পাশা, যতক্ষণ না গাছপালার ভিতর দিয়ে সৈকত চোখে পড়ল। উত্তরের সৈকতের তুলনায় এখানে পাথরের চেয়ে বালি বেশি, আশি-নব্বই ফুট চওড়া, তার ওপাশে ঢেউ আছড়ে পড়ছে।

কোনও বোট দেখা গেল না। কেউ আছে কি না ভালমত দেখে নিয়ে বন থেকে বেরোল ও। বনের কিনার ধরে দৌড়ে চলল আবার উত্তরে, দ্বীপ ঘুরে ফিরে যাচ্ছে মৃদু ঢেউয়ে যেখানে দোল খাচ্ছে সি কুইন ও অন্য বোটটা। দ্বীপের উত্তর-পূর্ব কোণায় এসে গতি কমাল, যতটা সম্ভব মাথা নুইয়ে দেহটাকে নিচু করে এগিয়ে চলল।

অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে আছে ডুয়েরো আর তার বাহিনী। উজ্জ্বল স্পটলাইটের আলো ফেলে দিনের মত আলোকিত করে রেখেছে বোটের কাছের তীরভূমি। পিন্টোর সঙ্গে নিজের বোটের ফ্লাইং ব্রিজে রয়েছে ডুয়েরো। ককপিটে পাহারা দিচ্ছে দুজন গানম্যান। আরও দুজন পায়চারি করছে তীরে।

সি কুইনে কেউ নেই।

হামাগুড়ি দিয়ে পানির কিনারে চলে এল পাশা। পানিতে নামল। যাতে না ভেজে সেজন্য এম-১৬টাকে উঁচু করে ধরে রেখে এগিয়ে চলল সি কুইনের দিকে। পানির ওপরে রয়েছে শুধু ওর মাথা আর রাইফেলটা।

পায়ের নিচে প্রচুর পাথর, এবড়োখেবড়ো, যে কোন মুহূর্তে পা পিছলানোর ভয়। এক পা বাড়িয়ে কোথায় রেখেছে, ঠিকমত রেখেছে কি না, নিশ্চিত না হয়ে আরেক পা বাড়াচ্ছে না।

তীরে নেমে বনে ঢুকেছে যে চারজন গানম্যান, পানির দিক থেকে

আক্রমণ আশা করছে না ওরা। পিন্টোর ওপর মোটেও সন্তুষ্ট নয় ডুয়েরো, ওর ভাবভঙ্গি আর বার বার তর্জনী তুলে ঝাঁকানো দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

ক্রমশ গভীর হয়ে আসছে পানি। বোটের কাছ থেকে চল্লিশ ফুট দূরে থাকতে হঠাৎ প্রায় খাড়া হয়ে নেমে গেল ঢাল। অনেকখানি পাশে সরেও মাটি ঠেকল না পায়ে। সাঁতরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

খুব ধীরে ধীরে, এমনভাবে সাঁতরে চলল ও, যাতে ঢেউ বেশি না ওঠে, শব্দ না হয়। রাইফেলটা না ভিজিয়ে আর পারল না। প্রয়োজনের সময় এটা ঠিকমত কাজ করবে কি না আর, জানে না। স্থির বাতাসে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে পিন্টো আর ডুয়েরোর কণ্ঠ। কথা বেশির ভাগ ডুয়েরোই বলছে।

'ইচ্ছে করছে তোমাকে হাঙরের মুখে ছুঁড়ে দিই, র‍্যামন! ওই টিকটিকিটাকে শেষ করে দেয়া উচিত ছিল তোমার, যেভাবে আমি বলে দিয়েছিলাম!'

'চেষ্টা করেছি,' ভীত কুকুরের মত কুঁই-কুঁই করে বলল পিন্টো। 'কিন্তু লোকটা মানুষ নয়, শয়তানের চ্যালা। গায়ে এত জোর, আর এত ক্ষিপ্রতা, চিতাবাঘেও ওর সঙ্গে পারবে না। হ্যাসি আর টনির মত আমাকেও যে মেরে ফেলেনি, এটা আমার ভাগ্য!'

'ওই দুটো তো গাধা। আমাকে বলা হয়েছে, কী-ওয়েস্টে ওদের চেয়ে দক্ষ আর কেউ নেই। দক্ষতার নমুনা তো দেখলাম। এখন আর কারও ওপর ভরসা না করে যা করার নিজেকেই করতে হবে আমাকে।'

'এত চিন্তা করছেন কেন? আমাদের এতজনকে মেরে এখান থেকে

বেরোনোর সাধ্য হবে না শয়তানটার,' হাসি হাসি কণ্ঠে বলল পিন্টো।

যেন ওর কথা ভুল প্রমাণ করতেই ঠিক এ সময় বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল জঙ্গল। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেল।

'ওই যে!' চেঁচিয়ে উঠল পিন্টো। 'দিয়েছে খতম করে!'

'চুপ, গাধা কোথাকার!' গর্জে উঠল ডুয়েরো। 'ওদের কাছে গ্রিনেড নেই!' চিৎকার করে গানম্যানদের হুকুম দিল ও।

ততক্ষণে সি কুইনের কাছে পৌঁছে গেছে পাশা, কিনার ধরে ঝুলে পড়েছে। স্পটলাইটগুলো সব তীরের দিকে ফেরানো, তাই প্রায় অন্ধকারের মধ্যেই বোটের সামনের ডেকে উঠে এল ও। মাস্তুলের দিকে এগোচ্ছে, এ সময় ধুপ করে ভারী একটা জিনিস পড়ল বোটে, প্রচণ্ড ঢেউয়ে যেন দুলে উঠে গড়ান খেল বোট।

অন্য বোটটা থেকে ককপিটে লাফিয়ে পড়েছে পিন্টো। বিড়বিড় করে কিছু বলতে বলতে মই বেয়ে ব্রিজে উঠল। চেঁচিয়ে বলল, 'আমি আপনার পিছন পিছন আসছি, বস!'

খোলা জায়গায় দাঁড়ানো পাশা। লুকানোর জায়গা নেই। রেলিঙের ওপর দিয়ে উঁকি দিলে এখন চমকে যেত পিন্টো। কিন্তু এদিকে নজর নেই ওর, নোঙর তোলায় মনোযোগ, তাই পাশাকে দেখল না। এই সুযোগে হামাগুড়ি দিয়ে একটা বরগার কাছে সরে গেল পাশা। নিঃশব্দে মাথা তুলে, খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে ককপিটের ওপর দিয়ে তাকাল।

তীরের গানম্যান দুজন ফিরে এসেছে ডুয়েরোর বোটে। খোলা সাগরের দিকে চলতে শুরু করল বোটটা।

বোটেও গ্রেনেড ছোঁড়া হতে পারে, এই ভয় পাচ্ছে হয়তো ডুয়েরো,

ভাবল পাশা। ওর অনুমান সত্যি, বুঝল, যখন দেখল তীর থেকে পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে গিয়ে থেমে গেল বোটটা।

সারাটাক্ষণ বিড়বিড় করছে পিন্টো। ডুয়েরোর বোটের পিছন পিছন চলছিল। কয়েক গজ এগিয়ে এসে ওটার পাশে রাখল সি কুইনকে। ইঞ্জিন বন্ধ করে বোটের পাশে এসে দাঁড়াল। 'মালগুলো আসতে কতক্ষণ লাগবে?'

'কেন, তাড়া আছে তোমার?' খেঁকিয়ে উঠল ডুয়েরো।

'না না, তাড়া কীসের?' তাড়াতাড়ি বলল পিন্টো।

চারজন গানম্যানের অবস্থান দেখল পাশা। কিছু একটা করার সময় হয়েছে ওর। প্ল্যানমাফিক সব ঘটলে, শুধু বন্দুকবাজগুলোকে শেষ করবে। আর আহত করে হলেও ডুয়েরোকে জ্যান্ত ধরতে চায় ও। রিং লিডারের কাছ থেকে তথ্য আদায় করা দরকার।

কিন্তু ঠিক এই সময় ঘটল অঘটন। কালো পোশাক পরা দুজন গানম্যান এসে দাঁড়াল সৈকতে; দুজনের মধ্যে লম্বা লোকটা চিৎকার করে বলল, 'মিস্টার ডুয়েরো! ডেভি আর ক্রুড মারা গেছে! ফাঁদ পাতা গ্রেনেডে পা দিয়েছিল!'

মইয়ের মাথায় সরে এল ডুয়েরো। 'অসাবধান হলে তো মরবেই। রিকো, আবার যাও তোমরা। ওদের মত ভুল কোরো না। আর সারারাত লাগিয়ে দিয়ো না।'

ঘুরতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেল রিকো। সি কুইনের দিকে তাকিয়ে দ্রুত এগোল দুই কদম। লোকটা কথা বলার আগেই পাশা বুঝে গেল, ওকে দেখে ফেলেছে রিকো।

'মিস্টার ডুয়েরো! মনে হচ্ছে পিন্টোর বোটে আরও কেউ আছে!'

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই নড়ে উঠেছে পাশা। একটা জিন

পোল টেনে নিয়ে, সেটার লম্বা ডান্ডার মাথায় ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠল ককপিটে, ফাইটিং চেয়ারটার কাছে। ডেকে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে এম-১৬টা কাঁধে ঠেকিয়ে ডুয়েরোর বোটের একজন গানম্যানকে গুলি করল তিনবার। পড়ে গেল লোকটা। গোড়ালিতে ভর দিয়ে সামান্য ঘুরে আবার ট্রিগার টিপল। খুলি উড়িয়ে দিল আরেকজন গানম্যানের।

হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল যেন বাকি সবাই। ডুয়েরোর বোটের ককপিটে দাঁড়ানো দুজন, আর তীরে দাঁড়ানো দুজন–সবাই একসঙ্গে গুলি শুরু করল।

মাথা নিচু করে ফেলল পাশা। ওর কানের আশপাশ আর মাথার ওপর দিয়ে গুঞ্জন তুলে চলে গেল যেন এক ঝাঁক ভীমরুল। গুলি বিঁধল বরগা, ফাইটিং চেয়ার, আর ককপিটের সামনের স্লাইডিং ডোর-এ। পাশার মাথার ওপরে রাগে চিৎকার করে উঠল পিন্টো, ওর প্রিয় বোটটাকে গুলিবিদ্ধ হতে দেখে।

ভুল করল গানম্যানরা। শত্রুকে খতম করার উত্তেজনায় ওদের ম্যাগাজিনের সমস্ত গুলি শেষ করে ফেলল ফিশিং বোটটাকে টার্গেট করে।

ততক্ষণে পাল্টা গুলি চালানোর জন্য তৈরি হয়ে গেছে পাশা। এম-১৬-এর সিলেক্টর আবার 'অটোফায়ার'-এ ঘুরিয়ে নিয়েছে। তীরের দিকে তাক করে ট্রিগার টিপল। ঝাঁঝরা হয়ে গেল রিকো আর ওর সঙ্গী। বুলেটের আঘাতে বিচিত্র ভঙ্গিতে ঝাঁকি খেতে খেতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কী ঘটেছে, দেখার অপেক্ষা করল না পাশা। পাক খেয়ে ঘুরে গেল ডুয়েরোর বোটের দিকে। মরিয়া হয়ে এসএমজি-র চেম্বারে নতুন ম্যাগাজিন ঢোকাতে ব্যস্ত ওরা। দেরি করে ফেলল।

কোমরে বাঁট ঠেকিয়ে গুলি করল পাশা। ফেলে দিল দুজনকে।
বোটের কিনারে ছুটে এল পাশা। রাইফেলের নল উঁচু করল। কিন্তু ডুয়েরোকে দেখল না। রিং লিডারকে পালাতে দিতে রাজি নয় ও। বোটের কিনারে পা রেখে অন্য বোটটাতে ওঠার জন্য লাফ দিতে যাবে, থেমে গেল ভয়ঙ্কর এক খেপা চিৎকার শুনে। মুখ তুলে তাকাল সি কুইনের ফ্লাইং ব্রিজের দিকে।
উড়ে আসছে পিন্টো। মাঝপথে রয়েছে। ডান হাতে চকচকে ছুরি, সেই বাটারফ্লাই নাইফ। প্রতিশোধের নেশায় অন্ধ চিতাবাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল পাশার ওপর। কোনমতে রাইফেলের নল ঘুরিয়ে ছুরির প্রথম আঘাতটা ঠেকানোর সুযোগ পেল পাশা। উল্টে পানিতে পড়ে গেল। ওপরে রয়েছে পিন্টো। পাশার মুখ আর গলায় পোঁচ মারার চেষ্টা করছে। পানিতে ডুবে ডান পাশে সরে গেল পাশা। একই সঙ্গে ভুস সরে পানিতে মাথা তুলল দুজনে। ততক্ষণে কা-বার ফাইটিং নাইফটা হাতে চলে এসেছে পাশার। পিন্টো আবার ওকে ছুরি মারতে আসতেই ফাইটিং নাইফের ফলা পুরোটাই ওর বুকে ঢুকিয়ে দিল পাশা।
ব্যথায় চিৎকার দিয়ে চিত হয়ে গেল পিন্টো। একবার ডিগবাজি খেয়ে তলিয়ে গেল পানিতে। আর উঠল না। ডিগবাজি খাওয়ার সময়ই মরে গেছে।
এরপর দুটো ঘটনা একসঙ্গে ঘটল। প্রথমটা হলো, ডুয়েরোর বোটের টুইন ইঞ্জিন খকখক করে কাশি দিল, ফুটফুট করে বন্ধ হয়ে গেল; তাড়াহুড়ো করে স্টার্ট দিতে যাওয়ায় নিশ্চয় বেশি তেল ঢুকে ডুবিয়ে দিয়েছে ফিউল-ইনটেক ভালভ। পাগলের মত স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করছে ও। আর দ্বিতীয় ঘটনা, জঙ্গল থেকে তীরে বেরিয়ে

এসেছে বাকি দুজন গানম্যান। পানির কিনারে দৌড়ে আসছে ওদের 'বস'কে সহযোগিতা করার জন্য।

পাশার আশেপাশে ছোট ছোট প্রস্রবণ যেন লাফিয়ে উঠছে বুলেটের আঘাতে। সি কুইনের পাশে সরে গেল ও। গুলি থেকে আড়াল করল নিজেকে। অতি উত্তেজনায় কী করছে ভুলে গিয়ে খোলা জায়গায় চলে এসেছে। তার ওপর আবার পানি ভেঙে বোটের দিকে এগোচ্ছে। ওদের বোকামির সুযোগটা কাজে লাগাল পাশা।

লোকগুলো বিশ ফুট দূরে থাকতে গুলি করল ও। হাঁটু পানিতে রয়েছে ওরা। প্রথমজন কোন সুযোগই পেল না। দ্বিতীয়জন পাশাকে লক্ষ্য করে গুলি করেই চলেছে। পাশার কিছু করতে পারল না, তবে পাল্টা গুলিতে নিজের মুখটাকে রক্তাক্ত করে পড়ে গেল পানিতে।

এতক্ষণে ডুয়েরোর দিকে নজর দেয়ার সুযোগ পেল পাশা। কিন্তু সে ঘুরতেই ডুয়েরোর বোটটার ইঞ্জিন চালু হয়ে গেল। দ্রুত দুই কদম এগিয়ে এসে হাত সামনে বাড়িয়ে ঝাঁপ দিল ও। কিনারা স্পর্শ করল আঙুলগুলো। ধরে রাখতে পারল না। পিছলে গেল। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল বোটটা। প্রপেলারের ঢেউ ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ওকে।

পিছনে তাকাল পাশা। হাসি ফুটল মুখে।

একটা সেকেন্ড সময় নষ্ট করল না ও। সি কুইনে উঠে পড়ল। মই বেয়ে প্রায় উড়ে চলে এল যেন ফ্লাইং ডেকে। বিশ গজও এগোতে পারেনি তখনও দ্বিতীয় বোটটা। পিন্টো আবার আগের মত সুইচ বন্ধ না করে রাখলেই হয়, ওটা খুঁজতে গেলে অনেক সময় লাগবে, বহুদূরে চলে যাবে ততক্ষণে ডুয়েরো।

কিন্তু চাবিতে এক মোচড় দিতেই চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন। টুইন থ্রটল

পুরোটা খুলে দিয়ে ডুয়েরোর পিছু নিল। গাছের খোড়লে ফেলে আসা ব্যাগটার কথা ভাবল একবার। ওটা যে কোন সময় ফিরে এসে বের করে নিতে পারবে।

ইঞ্জিনকে যতটা সম্ভব খাটাচ্ছে পাশা, সর্বোচ্চ গতিবেগ তুলে দিল। ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা খাওয়া এড়ানোর জন্য সরে এসেছে পশ্চিমে।

বাতাস স্থির হয়ে থাকায় সুবিধে হয়েছে, ঢেউ উঠছে না তেমন, কর্কের মত দুলতে দুলতে ছুটে চলেছে বোট দুটো। কনসোলে নিজের সামনে এম-১৬টা রেখে এক ঝাঁক গুলি বর্ষণ করল পাশা। ডুয়েরোর বোটের আগে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

শীঘ্রি বুঝতে পারল, সমান হর্সপাওয়ারে চলছে দুটো বোট। থ্রটল পুরো খুলে দিয়েও দূরত্ব কমাতে পারছে না পাশা। কী করা যায় ভাবছে, এ সময় অদ্ভুত একটা কাণ্ড করল ডুয়েরো।

হঠাৎ বোটের গতি কমিয়ে দিল ও। ডান হাতে রেডিওর মত একটা জিনিস ধরে রেখে অন্য হাতটা বারবার তুলছে সি কুইনের দিকে, যেন কাউকে বোটটা দেখাচ্ছে।

অবাক হয়ে, পাশাও গতি কমাল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কারও সঙ্গে যোগাযোগ করছে ডুয়েরো, হয়তো কাছাকাছি থাকা অন্য কোন বোটের সঙ্গে। চারপাশে তাকাল পাশা। একটা বোটও চোখে পড়ল না, শুধু অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে উত্তর-পশ্চিমে একটা ডুবোপাহাড়ের পিঠ উঁচু হয়ে আছে। ওকে আরও অবাক করে দিয়ে চোখের সামনে নড়ে উঠল পিঠটা।

চোখের পাতা সরু করে আনল পাশা। প্রথমে মনে হলো, ভুল দেখছে। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরেই পানিতে মৃদু ঢেউ দেখে নিশ্চিত হলো, পাহাড়টা সত্যিই নড়ছে, আর ওটার সামনে থেকে

আরেকটা জিনিস–তীরের মাথার মত দেখতে–ছুটে আসছে সি কুইনের দিকে।

ডুয়েরোর খলখল হাসি ভেসে এল পানির ওপর দিয়ে, আত্মতৃপ্তির হাসি। বোট থামিয়ে দিয়ে পিছনের রেলিঙের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছে।

বহু বছরের অভিজ্ঞতা আর ক্রমাগত এ ধরনের বিপজ্জনক কাজ সাধারণ মানুষের চেয়ে পাশার ইন্দ্রিয়কে অনেক বেশি ধারাল করে তুলেছে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়র ভিতরেও আরেকটা ইন্দ্রিয় রয়েছে ওর, একটা ইন্টারনাল অ্যালার্ম সিস্টেম, যেটা ওকে সাবধান করে দিয়ে কত অসংখ্যবার যে ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে, তার কোন হিসেব নেই। এখনও আবার বেজে উঠল সেই ঘণ্টাটা। ভিতর থেকে যেন মৃদু একটা কণ্ঠ ডেকে ওকে সাবধান করে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল পাশা। হুইল ঘুরিয়ে, গতি বাড়িয়ে ছুটতে শুরু করল দক্ষিণ-পশ্চিমে, ডুবোপাহাড়ের পিঠের মত জিনিসটার দিকে। বুঝতে পারছে ওটা বিপজ্জনক, কিন্তু তারচেয়েও বেশি বিপজ্জনক এখন ছুটে আসা জিনিসটা।

ক্রমেই গতি বাড়ছে ছুটন্ত জিনিসটার। দ্রুত কাছে আসছে। তবে এখনও এতটাই দূরে রয়েছে, পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে না।

সাঁই করে ডানে কাটল পাশা, তারপর বাঁয়ে। যা সন্দেহ করেছে জিনিসটা যদি তা-ই হয়ে থাকে তো এভাবে এঁকেবেঁকে চললে কাটানো যেতে পারে। হঠাৎ সি কুইনের পাশ দিয়ে পানিতে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে চলে গেল জিনিসটা। কোন শব্দ করল না, কিংবা করলেও সেটা এতই কম, বোটের ইঞ্জিনের শব্দে ঢাকা পড়ে গেল। পাশার ধারণাই ঠিক হয়েছে, জিনিসটা কী, চিনেছে ও ডানে কেটে

জিনিসটা থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরাল বোট, চূড়ান্ত অঘটন ঘটে যাওয়ার আগেই। পিন্টোর বোটটা ভাল, চমৎকার সাড়া দেয়।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণ যেন চুরমার করে দিল অন্ধকারকে। কনসোলের ওপর ঝুঁকে থেকে পিছনে ফিরে তাকাল পাশা। একটা ডুবোপাহাড়ে আঘাত হেনে চূড়ো উড়িয়ে দিয়েছে ছুটন্ত জিনিসটা।

বিস্ময়কর যে সচল ডুবোপাহাড়টা, ওটা আসলে একটা জলযান, মিনি-সাবমেরিন। আর ওটা থেকে যে জিনিসটা ছোঁড়া হয়েছে, সেটা টর্পেডো। সাবমেরিনটাকে খুঁজল পাশার চোখ। উধাও হয়েছে রহস্যময় জলযানটা। তবে পাশা নিশ্চিত, চলে যায়নি ওটা, ডুব দিয়েছে, কাছে এসে নতুনভাবে টর্পেডোর আক্রমণ চালাবে।

এ সময় অন্য আরেকটা বিপদ দেখা দিল। সামনে তাকিয়ে পাশা দেখে, বোটের হুইল ডানে ঘোরানোয় সোজা ডুয়েরোর বোটের দিকে চলেছে সি কুইন, এ পথে এগোতে থাকলে মুখোমুখি গুঁতো লাগবে।

রেডিওতে আবার কথা বলছে ডুয়েরো, নিশ্চয় পাশার নতুন অবস্থান জানাচ্ছে।

একটা বুদ্ধি এল পাশার মাথায়। পানির নীচ থেকে যে-ই ওকে উড়িয়ে দিতে চাইছে, কাছাকাছি ডুয়েরো থাকলে নিশ্চয় সে-চেষ্টা আর করবে না। গতি কমাল পাশা। নিখুঁতভাবে গুঁতো বাঁচিয়ে সি কুইনকে দ্বিতীয় বোটটার পাশে নিয়ে এল। দুটো বোটের ঘষা লাগার শব্দ হলো।

রেডিওতে কথা বলায় মনোযোগ ডুয়েরোর, তাই লক্ষ করেনি এতক্ষণ, ঘষার শব্দে চমকে গিয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে তাকাল।

ইঞ্জিন নিউট্রালে রেখে দৌড়ে এসে রেলিং ডিঙিয়ে লাফ দিল পাশা। একটা মুহূর্তের জন্য মনে হলো, মিস করবে, শূন্য থেকে পানিতে পড়ে যাবে। কিন্তু ওর পা বাধল বোটের হ্যান্ডরেইলে, থাবা দিয়ে ফ্লাইং ব্রিজের কিনারা ধরে ফেলে দোল দিয়ে উঠে গেল ওপরে।

চালকের সিটের পাশে রেডিও রেখে দিয়ে ডান কোমরে ঝোলানো খাপে রাখা পিস্তলের বাঁটে হাত দিল ডুয়েরো। দুই পা বাড়িয়ে দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল পাশা। ডুয়েরোর বুকে আঘাত হানল টান টান করে দেয়া পা দুটো। প্রথমে সিটের ওপর পড়ল ডুয়েরো, সেখান থেকে ডিগবাজি খেয়ে ডেকে। চার হাতপায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কোণঠাসা চিতাবাঘের মত দাঁত খিঁচাচ্ছে। আবার পিস্তল খুলতে হাত বাড়াল। বের করে ফেলেছে, এ সময় পাশার ডান পায়ের প্রচণ্ড লাথি লাগল ওর চোয়ালে, আবার পড়ে গেল ও।

ডুয়েরোর হাতের পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলল পাশা। ওর ডান হাতটা ধরে মুচড়ে নিয়ে এল পিঠের ওপর। আরেক হাতে ঝাঁকড়া চুল খামচে ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, 'ওদের বলো, কিছু না করতে!'

লাথি খেয়ে কাবু হয়ে গেছে ডুয়েরো। ঘোলাটে ভাবটা কাটাতে মাথা ঝাড়ছে। ছটছট করছে পাশার হাত থেকে ছোটার জন্য। কিন্তু ইস্পাতের ভাইসের মত কঠিন হাতে ধরে রেখেছে পাশা। ছুটতে না পেরে ডুয়েরো বলল, 'বোকামি কোরো না, গ্রিংগো! সময় থাকতে ছেড়ে দাও আমাকে। তাহলে বাঁচার একটা সুযোগ করে দিতে পারি তোমাকে। তোমাকে অনেক টাকার ব্যবস্থা করে দেব আমি, এত টাকা, জীবনে যা চোখেও দেখনি।'

'ওদের থামতে বলো!' কঠিন কণ্ঠে আদেশ দিল পাশা।

'কেন ভয় পাচ্ছ? আমি না বলা পর্যন্ত কিছু করবে না ওরা,' গোঁ-গোঁ করে বলল ডুয়েরো।

পানির দিকে তাকাল পাশা। চোখের কোণে দেখল, পানির নিচ দিয়ে তীব্র গতিতে বোট দুটো লক্ষ্য করে ছুটে আসছে কী যেন।

ডুয়েরোর চোখে পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, করছে কী ওরা! আমার প্রাণ চলে গেলেও মুখ খুলব না, সেটা তো জানে!'

পাঁচ

পাশা বুঝল, ওর অনুমান ভুল হয়েছে। মিনি-সাবমেরিনের নাবিকরা এখন আর গুরুত্বপূর্ণ ভাবছে না ডুয়েরোকে, বরং ওকে সরিয়ে দেয়াটাই ভাল মনে করেছে। সে-কারণেই আরেকটা টর্পেডো ছুঁড়েছে।

মানুষের মন-যন্ত্রটার কোনও তুলনা হয় না। আর এ কারণেই মানবমনকে ঈর্ষা করে সিলিকন ভ্যালি থেকে শুরু করে টোকিওর সমস্ত কম্পিউটার ডিজাইনাররা। যত দ্রুতই কাজ করুক না কেন কম্পিউটার, যত বেশি মেগাবাইটের মেমোরিই লাগানো হোক না কেন, মানবমনের মত জটিলতা আর দ্রুততার সঙ্গে পাল্লা দেয়ার সাধ্য কোন কম্পিউটারেরই নেই। যে মুহূর্তে টর্পেডোটার ওপর চোখ পড়েছে পাশার, সাথে সাথে ভাবনা খেলে গেছে মনে–তিনটে

বিকল্প আছে এখন ওর হাতে। এক, ডুয়েরোকে ছেড়ে বোটের অন্যপাশ দিয়ে লাফিয়ে পড়া; কিন্তু তাতে দুটো বোটই ধ্বংস হয়ে যাবে, আর তাহলে সাগরের মাঝখানে হাবুডুবু খেতে খেতে ভেসে থেকে অন্য কোনও বোটের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না ওর। দুই, স্যান্টোরোর বোটটাকে নিয়ে সরে যাওয়ার চিন্তা করতে পারে। কিন্তু সমস্যাটা হলো, এটার ইঞ্জিন তাড়াহুড়ো করে চালু করতে গেলে বেশি তেল চলে আসে–ইতিমধ্যেই একবার এটা ঘটেছে। এবারও যদি সেরকম ঘটে, দেশে কবর দিতে পাঠানোর জন্য ওর দেহের টুকরোগুলোও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর তিন নম্বর বিকল্পটা হলো, সি কুইনে লাফিয়ে পড়ে থ্রটল পুরো খুলে দেয়া।

মাত্র কয়েক হার্টবিট সময়ের মধ্যে কথাগুলো খেলে গেল পাশার মনে। তৃতীয় বিকল্পটাই বেছে নিল ও।

এক ধাক্কায় ডুয়েরোকে সরিয়ে দিয়ে দৌড়ে এসে লাফ দিল ব্রিজের কিনার থেকে। লাফ দেয়ার সময় ধাক্কাটাতে পুরো জোর দিতে পারেনি, আর তার খেসারত দিতে হলো। সি কুইনে নামতে গিয়ে বাঁ পা'টা পিছলে গেল, তাল সামলাতে না পেরে হোঁচট হয়ে পড়ল কাকতালীয়ভাবে একেবারে হুইলের ওপর। হুইল ধরে নিজেকে সোজা করছে, একই সঙ্গে হাত বাড়িয়ে মোচড় দিল স্টার্টারে, সঙ্গে সঙ্গে জ্যান্ত হয়ে গেল বোটের ইঞ্জিন, উত্তরে ছুটল পাশা।

ডুয়েরোও বোট চালানোর চেষ্টা করছে। থ্রটলটাকে ঠেলে দিল যতদূর যায়। কিন্তু বোটের গতি বাড়ার বদলে ফুটফুট শুরু করল ইঞ্জিন, দুলে উঠল বোট, আরও একবার ডিজেলে ডুবে গেছে ফিউল-ইনটেক ভালভ।

মস্ত একটা তীরের মাথার মত পানি কেটে ছুটে আসছে টরপেডো। ওটার দিকে তাকিয়ে অসহায় রাগে চিৎকার করে উঠল ও।

ডুয়েরোকে থ্রটলের মাথায় কিল মারতে দেখল পাশা। তারপর পাক খেয়ে ঘুরে ফিশিং বোটের পিছনে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল লোকটা। কিন্তু শূন্যেই রয়ে গেল ওর বাড়ানো পা'টা। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ, পরক্ষণে ডুয়েরোর বোটের সামনের দিকটা উঁচু হয়ে গিয়ে পানি থেকে লাফিয়ে উঠল বোট। ফিউল ট্যাংক বিস্ফোরিত হওয়ার শব্দ শোনা গেল পর পর দু'বার। মস্ত একটা আগুনের কুণ্ড যেন গ্রাস করে ফেলল বোটটাকে, বৃষ্টির মত ঝরে পড়তে লাগল পোড়া কাঠের টুকরো আর বোটের অন্যান্য ভাঙা অংশ।

দক্ষিণ-পশ্চিমে চলল পাশা। পিছে তাড়া করে আসবে সাবমেরিনটা, জানা কথা। ওটার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে কি না সি কুইন, সর্বোচ্চ কত গতিবেগে ছুটতে পারে, জানে না। তবে যদি কাছাকাছি থেকে থাকে, তো ওটা থেকে ছোঁড়া টরপেডোর সঙ্গে কিছুতেই পারবে না বোটটা, এটা ঠিক।

দীর্ঘ দশটি টান টান উত্তেজনার মিনিট পার করল পাশা, ছুরির মত সাগরের পানি কেটে ছুটে চলেছে সি কুইন। বার বার পিছনে ফিরে তাকাচ্ছে ও। ডুয়েরোর পোড়া বোটের জ্বলন্ত অবশিষ্টাংশের কাছে পানি ফুঁড়ে মাথা তুলতে দেখল একটা চকচকে জিনিসকে। সাবমেরিনের পেরিস্কোপ। ঘুরছে ওটা। পেরিস্কোপের লেন্সে চাঁদের আলো পড়ে মৃদু দীপ্তি ছড়াচ্ছে। সি কুইনের দিকেই তাকিয়ে আছে ওটা, বুঝতে অসুবিধে হলো না পাশার। রানিং লাইট নিভিয়ে দিয়ে, দক্ষিণে কোর্স সেট করল ও।

মিহি পানির ফোয়ার তুলে, পানিতে তলিয়ে গেল পেরিস্কোপ।

এরপর কী ঘটবে, জানে না পাশা। সব কিছু নির্ভর করছে এখন সাবমেরিনটার গতিবেগ–কতখানি জোরে ছুটতে পারে ওটা–তার ওপর। কী-ওয়েস্টের বন্দরে ভিড়ানো বোট আর জাহাজগুলোর আলো চোখে পড়ার পরও নিশ্চিন্ত হতে পারল না ও। আলোগুলো অনেক কাছে চলে আসার পরও যখন কিছু ঘটল না, তখন গিয়ে সত্যিকার অর্থেই চেয়ারে হেলান দেয়ার বিলাসিতাটা উপভোগ করল পাশা। দ্বীপে ফেলে আসা ওর মূল্যবান জিনিসপত্র ভরা ব্যাগটার কথা মনে পড়ল। আগামী দিন সময় পেলে আনতে যাবে ওটা, ভাবল ও। তবে এখন সবচেয়ে জরুরি হলো, অদ্ভুত মিনি-সাবমেরিনটার কথা স্টিফেন হান্টারকে ফোন করে জানানো।

*

'জানি,' অন্য প্রান্ত থেকে শান্তকণ্ঠে হান্টার বলল। 'দু'রাত আগে ওরকম একটা সাবমেরিন থেকে টরপেডো ছুঁড়ে অ্যালামেডা কোস্ট গার্ডের একটা পেট্রল বোট ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। এর সাক্ষীও আছে। দুটো ছেলে তখন খাঁড়ির পাড়ের উঁচু তীরে বসে হাওয়া খাচ্ছিল, হাই স্কুলে পড়ে ওরা। পুরো ঘটনাটাই ঘটতে দেখেছে।'

কী-ওয়েস্টের হোটেল রুমে পিঠের নীচে বালিশ দিয়ে বিছানায় আধশোয়া হয়ে আছে পাশা। 'তারমানে ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলেও ঘোরাফেরা করছে আরেকটা সাবমেরিন? কীসের বিরুদ্ধে লেগেছি আমরা? সাবমেরিনের বহর?'

'সেটা জানার দায়িত্বই দিয়েছেন আমাকে মিস্টার এক্স,' হান্টার বলল। 'মনে হচ্ছে মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই আর কোনদিন শেষ হবে না আমাদের।' এক মুহূর্ত থামল ও। 'টপ প্রায়োরিটি দিতে

হবে এটাকে, পাশা। এ সব সাবমেরিন কোথায় বানানো হয়, আমেরিকার সাগর সীমানায় কোন পথে ঢোকে, কোথায় লুকিয়ে থাকে, সব জানতে হবে আমাদের।'

'হুঁ!' পাশা বলল। 'খড়ের গাদায় সুচ খুঁজতে বলছ।'

'না, অতটা কঠিন বোধহয় হবে না। সাবমেরিন এত সস্তা জিনিস নয়, এমনকী মিনি-সাবমেরিনও অনেক দাম। লক্ষ-কোটি টাকার মালিক, যাদের কত টাকা আছে নিজেরাও জানে না, তাদের কারও পক্ষেই কেবল ওগুলো বানানো সম্ভব।'

একমত হলো পাশা। 'তাতে অবশ্য কাজের পরিধি ছোট হয়ে আসে, কিন্তু তারপরেও ডজন ডজন সন্দেহভাজনের ওপর নজর রাখতে হবে। প্রতিটি লোককে চেক করে আসল লোকটিকে শনাক্ত করাও যথেষ্ট কঠিন কাজ। প্রচুর সময় লাগবে।'

'আরেক দিক থেকে ভেবে দেখা যাক। সাবমেরিনের যন্ত্রাংশ স্পেশাল জিনিস। এমন নয় যে কাছের হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে গিয়ে কেউ কিনে আনতে পারবে। আমি খোঁজ নিতে লোক লাগাচ্ছি। আমার বিশ্বস্ত লোক আছে, টাকার জন্য যে হাঁড়িকাঠের নিচেও গলাটা বাড়িয়ে দিতে রাজি। কিছুটা সময় লাগবে, তবে সাবমেরিন নির্মাতাকে খুঁজে বের করবই।'

'ততদিন আমি কী করব?' পাশার প্রশ্ন।

'বসে থাকো। বিশ্রাম নাও। আশা করি খুব শীঘ্রি আবার সাগর-দানব শিকারে পাঠাতে পারব তোমাকে।'

*

অন্য সময় হলে খবরটা নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবত না হান্টার। কিন্তু তথাকতিথ সাগর-দানবের বর্ণনার সঙ্গে বর্তমানের ঘটনাপ্রবাহ

কৌতূহলী করে তুলল ওকে, বিশেষ করে কী-ওয়েস্টে পাশার দেখা সাবমেরিনের কথা শোনার পর। তিন সপ্তা আগের পুরানো খবরের কাগজ বের করে খুঁটিয়ে পড়ল আবার ইয়ট দুর্ঘটনার রিপোর্টগুলো। ন্যাশনাল হেডলাইন হয়ে গিয়েছিল খবরটা, যদিও লোকে পড়ে খুব একচোট হেসেছে।

ব্রুকলিনের অল্পবয়েসী, বিত্তবান এক দম্পতি দুটো ইয়ট কিনে লম্বা সফরে বেরোবে ঠিক করল। ইচ্ছে ছিল, আটলান্টিক সিবোর্ড ধরে এগোবে ওরা, যেখানে থামতে ইচ্ছে করবে সেখানেই থামবে। ফ্লোরিডা উপসাগর পার হয়ে উত্তর সেইন্ট পিটার্সবুর্গের দিকে এগোলো ইয়ট দুটো, আমেরিকার পশ্চিম উপকূলরেখা ধরে।

নেপলসের কাছে এসে ঘটল অঘটন।

গোধূলিবেলায় ইয়টের হুইলে দাঁড়ানো একজন ইয়টসম্যান সাগরের দিকে তাকিয়ে দেখে উত্তরে চলেছে একটা মালবাহী জাহাজ। ওটার পিছন পিছন যাচ্ছে একটা সাগর-দানব। দানবের খাটো মোটা শরীর আর সাপের মত লম্বা গলাটা স্পষ্ট দেখেছে বলে দাবী করেছে লোকটা। উত্তেজনা আর কল্পিত দানবকে বাস্তবে দেখার আগ্রহে কাউকে কিছু না বলে, অন্য ইয়টের চালককে সাবধান না করে, আচমকা ইয়টের নাক ঘুরিয়ে দিল ও।

ফল যা হবার হলো, গুঁতো খেয়ে ওখানেই ডুবে গেল দ্বিতীয় ইয়টটা, আর প্রথমটা ধুঁকতে ধুঁকতে বহু কষ্টে ফোর্ট মেয়ারের বন্দরে পৌঁছল। ওখানে কর্তৃপক্ষের কাছে দুর্ঘটনার রিপোর্ট করা হলো। খবর পেয়ে হতভাগ্য দম্পতির কাছে দলে দলে ছুটে এল সাংবাদিকেরা।

মিনি-সাবমেরিনকেই যে সাগর-দানব ভেবে ভুল করেছে

ইয়টসম্যান, তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না হান্টারের । সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল ও। স্পেশাল ইনভেস্টিগেট ইউনিটকে খোঁজখবর নিতে বলল। শিপিং রেকর্ড চেক করে জানা গেল, ঘটনাটা ঘটার সময় ওই এলাকায় মালবাহী জাহাজ ছিল তিনটে। একটা এসেছিল মেক্সিকো থেকে, একটা ব্রাজিল, আর তৃতীয়টা হনডিউরাসের পতাকাবাহী, কিন্তু কোম্পানিটা কলাম্বিয়ান। জাহাজটার নাম গ্রিফিথ।

কলাম্বিয়ার সঙ্গে গ্রিফিথের যোগাযোগ আরও কৌতূহলী করে তুলল হান্টারকে। জাহাজটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার নির্দেশ দিল তদন্তকারীদের। জানা গেল, প্রতি মাসে কলোম্বিয়া থেকে আমেরিকায় দুবার যাতায়াত করে ওটা। নানা ধরনের মাল বহন করে। একটা ব্যাপার দৃষ্টি আকর্ষণ করল হান্টারের , আর সেটা হলো–সব সময় কী-ওয়েস্টের পাশ দিয়েই যায় জাহাজটা, কোন যাত্রায়ই এর ব্যতিক্রম হয় না।

গ্রিফিথ এখন কোথায়, জানার চেষ্টা করল হান্টার। বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। সেইন্ট পিটার্সবুর্গে ওটা নোঙর করেছে, খবর পেয়ে পাশাকে ফোন করল ও। জাহাজটার ওপর চোখ রাখতে বলল। জানাল, আগের দিন ওখানে পৌঁছেছে গ্রিফিথ, ছত্রিশ ঘণ্টার আগে ছাড়বে না।

'সি-মনস্টারের কী হবে?' রসিকতা করল পাশা।

'সেজন্যই তো বলছি, সেইন্ট পিটার্সবুর্গে খোঁজ করোগে,' হেসে বলল হান্টার। 'গ্রিফিথের গায়ে সাগর-দানবের গন্ধ লেগে আছে।'

সামান্যতম দেরি না করে রওনা হলো পাশা। প্রাইভেট প্লেন ভাড়া করে সেইন্ট পিটার্সবুর্গ-ক্লিয়ারওয়াটার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে

পৌঁছল সেদিন দুপুরের সামান্য পরে, যেদিন সকালে ডুয়োরো আর তার বোটটা ধ্বংস করে দিয়ে কী-ওয়েস্টে ফিরেছে ও। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে এসে ডকের কিনারের একটা মোটেলে উঠল। রুমে ব্যাগ রেখে বেরোল।

দিনটা বেশ গরম। কিন্তু নীল রঙের একটা জ্যাকেট গায়ে দিয়েছে পাশা। সাগরের ধারের পুরানো কাপড়ের দোকান থেকে একটা সিম্যান'স ক্যাপ কিনে মাথায় দিল। কাঁধ কুঁজো করে, ক্যাপ নামিয়ে, কলার উঁচু করে, বন্দরের ব্যস্ত মানুষদের ভিড়ে মিশে গেল।

গ্রিফিথকে খুঁজে বের করা কঠিন হলো না। সারি দিয়ে নোঙর করা সাতটা মালবাহী জাহাজের মধ্যে প্রথম থেকে তৃতীয় জাহাজটা গ্রিফিথ। জাহাজের হোল্ডে মাল নামানো হচ্ছে।

মালের বাক্সের একটা স্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে পাশা, হঠাৎ মনে হলো কেউ ওর ওপর নজর রাখছে। মুখ তুলে দেখল, পি-জ্যাকেট পরা, ভুঁড়িওয়ালা মোটা একটা লোক ওর দিকে তাকিয়ে আছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, মাথায় এলেমেলো চুল। নিরীহ ভাব করে রইল পাশা, যেন খুব সাধারণ একজন পথচারী, জাহাজ দেখছে, গ্রিফিথের প্রতি কোন বিশেষ আগ্রহ নেই। কয়েক পা এগোল। পিছন ফিরে দেখে, লোকটা নেই।

আগামী সকালে জোয়ার এলে ছাড়বে গ্রিফিথ। ততক্ষণ বন্দরেই থাকবে। একটা দোকানের পে-ফোন থেকে হান্টারকে ফোন করে একটা সার্চ ওয়ারেন্ট ইস্যুর ব্যবস্থা করতে বলল পাশা।

'কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে না পারলে তো ওয়ারেন্ট ইস্যু করতে পারবেন না জাজ,' তিক্তকণ্ঠে বলল হান্টার। 'সরি, পাশা, যা

করার তোমাকেই করতে হবে, ওখানে আমি কোন সাহায্য করতে পারব না। যদি বিপদে পড়ো, নিজের চেষ্টায়ই উদ্ধার পেতে হবে। জাহাজটা ছাড়ার আগে স্পেশাল ইউনিট পাঠানোও সম্ভব নয়।'

'ওসব লাগবেও না। তুমি জানো, একা কাজ করতেই পছন্দ করি আমি। আচ্ছা, পরে যোগাযোগ করব।'

দিনের আলোয় কিছু করা যাবে না। মোটেলে ফিরে এল পাশা। হাতঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখল, সন্ধ্যে ছ'টা। ভালমত একটা ঘুম দিয়ে তরতাজা হয়ে উঠে শেভ সেরে, গোসল করে, তারপর বেরোবে।

ঘুমিয়ে পড়ল ও। অ্যালার্ম বাজার সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল। উঠে, ঠাণ্ডা পানিতে শাওয়ার নিয়ে চনমনে করে তুলল স্নায়ুগুলোকে। কাপড় পরে লবিতে এসে ভেনডিং মেশিন থেকে খুব কড়া এক কাপ কালো কফি খেয়ে আরও চাঙা করল শরীরটাকে। তারপর বেরিয়ে এল দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার গোধূলি ছাওয়া আকাশের নিচে।

অনেক নির্জন হয়ে এসেছে পানির ধারটা। ডে শিফটের কাজ শেষ, রাতের শিফট সবে শুরু হয়েছে। আশপাশ দিয়ে তাড়াহুড়ো করে হেঁটে যাচ্ছে বন্দর-শ্রমিকরা। পাশার দিকে নজর নেই কারও।

গ্রিফিথের ধার দিয়ে যাওয়ার সময় পাশ ফিরে তাকাল না ও। সামনে কতগুলো বাক্স দেয়াল তৈরি করে রেখেছে। ওগুলোর পাশ কাটানোর সময় একটা ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল জাহাজের ডেকে দাঁড়ানো নাবিকদের।

অন্ধকার হয়ে এল আকাশ। জ্বলে উঠল রাস্তার বাতিগুলো, পানির কিনারের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত। বন্দরে তীক্ষ্ণ ভেঁপু বাজাল একটা টাগবোট।

মাঝরাতের আগে কিছু করা যাবে না। নাবিকদের অধিকাংশ ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে পাশাকে।

ঠিক এ সময় পি-জ্যাকেট পরা সেই লোকটাকে দেখতে পেল ও। কয়েকজন রুক্ষ চেহারার নাবিককে সঙ্গে নিয়ে গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক বেয়ে নেমে আসছে লোকটা। তক্তার সিঁড়ির গোড়ায় নেমে পকেট থেকে একটা সিগার বের করে দাঁতে চেপে ধরল ও। লাফ দিয়ে এসে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দিল একজন নাবিক।

নিশ্চয় জাহাজের ক্যাপ্টেন, অনুমান করল পাশা। ছায়ায় গা মিশিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। লোকগুলো হাঁটতে শুরু করলে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে পিছু নিল ও।

একটা রেস্টুরেন্টের দিকে এগোচ্ছে দলটা। খোলা দরজা দিয়ে ভিতর থেকে কথা, হাসি আর মৃদু বাজনা শোনা যাচ্ছে। সারি দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল লোকগুলো।

ক্যাপটা টেনে নামিয়ে, এক মিনিট অপেক্ষা করে, পাশাও ঢুকে পড়ল রেস্টুরেন্টের ভিতর। দরজার ডান পাশে সরে, দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ভিতরে চোখ বোলাল। আলো এত কম, অন্ধকার চোখে সয়ে আসতে পুরো একটা মিনিট লাগল। সিগারেটের ধোঁয়ায় ভারী হয়ে আছে ঘরের বাতাস। মোটাসোটা এক মহিলা এগিয়ে এল পাশার দিকে। ভুরু কুঁচকে ওর আপাদমস্তক দেখে বলল, 'আগে তো কখনও দেখিনি আপনাকে? নতুন নাকি? আমি এই রেস্টুরেন্টের মালিক। আমার নাম ক্যাথি? কী লাগবে আপনার?'

ইতিমধ্যে গ্রিফিথের নাবিকেরা একটা টেবিলে বসে পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে জবাব দিল পাশা, 'এক কাপ কফি হলেই চলবে।'

নাবিকদের পাশের একটা টেবিলে বসল ও।

গ্রিফিথের নাবিকদের কোন তাড়া নেই। খাবারের অর্ডার দিল। পরের একটি ঘণ্টা শুধু খেয়ে আর খোশগল্প করে কাটাল।

খুব ধীরে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে পাশা। কান খাড়া। নাবিকদের টেবিলের খুব কাছাকাছি বসেছে। ওদের কথা সব শুনতে পাচ্ছে। বেশির ভাগ গল্পই সাগর আর জাহাজের। জমিয়ে বসেছে নাবিকেরা। চট করে গিয়ে গ্রিফিথে ঢুঁ মেরে আসার এটাই সুযোগ। উঠতে যাবে পাশা, ঠিক এ সময় অন্য আরেকটা টেবিল থেকে আরেকজন লোকের মন্তব্য কানে আসতে স্থির হয়ে গেল।

লম্বা একজন নাবিক, মুখে চাপদাড়ি, চেয়ারে ঘুরে বসে পি-জ্যাকেটের দিকে তাকাল। 'আরি, ফার্নান্দো, কোথায় ছিলে এতদিন? সেই সাগর-দানবটাকে নিয়ে ঘুরতে বেরোনোর পর থেকে আর তো তোমার কোন খবরই নেই।'

দুই টেবিলেরই কয়েকজন লোক হেসে উঠল, তবে ক্যাপ্টেন ফার্নান্দো হাসল না। গম্ভীর মুখে জবাব দিল, 'জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকি আমি, পিরানো।'

এক হাত উঁচু করে তালুতে একটা খাবারের ট্রে নিয়ে পাশার পাশ কাটাল ক্যাথি। ফার্নান্দোর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'এই সাগর-দানবটা আবার কী জিনিস?'

হেসে উঠল পিরানো। 'কেন, কয়েক দিন আগের খবর পড়নি? নিউ ইয়র্ক থেকে আসা কতগুলো গাধা ফার্নান্দোর জাহাজের পিছন পিছন একটা সাগর-দানবকে যেতে দেখে এমন প্যান্ট খারাপ করে ফেলেছিল, নিজেদের ইয়টে ইয়টে গুঁতো লাগিয়ে মরতে মরতে বেঁচেছে।'

'খবরটা পড়েছি,' ফার্নান্দোর দিকে তাকিয়ে হাসল ক্যাথি। 'কিন্তু এর মধ্যে তো গ্রিফিথের নাম দেখলাম না।'

'দেখনি, তার কারণ আছে,' ফার্নান্দো বলল। 'ওসব গাঁজাখুরি গপ্পে নিজের নাম ঢোকাতে চাইনি আমি। সাগর-দানব বলে কোন জিনিস নেই। আমার জাহাজের পিছন পিছন এলে নাবিকদের কেউ দেখল না কেন?'

একটা ভুরু উঁচু করল পিরানো। 'আমার যদ্দুর মনে পড়ে, তোমার একজন নাবিক একবার একটা অস্বাভাবিক জিনিস দেখার কথা বলেছিল। বছরখানেক আগে, ভুলে গেছ? ওই যে, আর্জেন্টিনা থেকে আসা সেই অল্পবয়েসী লোকটা, যে জাহাজ থেকে পড়ে গিয়ে ডুবে মরেছিল।'

'তোমার স্মৃতিশক্তি যে এত ভাল জানতাম না,' রুক্ষকণ্ঠে ক্যাপ্টেন বলল। 'কিন্তু সেটা তো এক বছর আগের ঘটনা। এর সঙ্গে ইয়ট অ্যাক্সিডেন্টের কোন সম্পর্ক নেই।'

ফার্নান্দোর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল পিরানো। 'না, তা ঠিক। এটা নিশ্চয় অন্য আরেকটা সাগর-দানব। আমার মনে হয়, তোমার জাহাজ থেকে এমন কিছুর গন্ধ বেরোয়, পচা মাংসের গন্ধ পেলে মাছি যেমন পাগল হয়ে যায়, দানবগুলোও তেমনিভাবে ছুটে আসে।'

চোখের পলকে দাঁড়িয়ে গেল ফার্নান্দো। পি-জ্যাকেটের পকেটে ঢুকে গেছে ডান হাত। 'খবরদার, আমার জাহাজের বদনাম করবে না! তোমার ওই নোংরা জিভ আমি কেটে নেব।'

তাড়াতাড়ি দুটো টেবিলের মাঝখানে এসে দাঁড়াল ক্যাথি। 'উঁহুঁ, ওসব চলবে না এখানে! তোমরা জানো, আমি ওসব বরদাস্ত করি

না। মারামারি যদি করতেই হয়, বাইরে যাও, পিছনের উঠানে। আরও ভাল হয়, যদি রাস্তায় চলে যাও। পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা করতে ভাল লাগে না আমার।'

'আরে থামো, থামো; শান্ত হও, দুজনেই,' পিরানো বলল। 'পুরানো দোস্তের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় আমি তো এমনি একটুখানি মজা করছিলাম। ফার্নান্দোকে আমি অপমান করতে চাইনি।'

'না করলেই ভাল,' ভোঁতাস্বরে বলল ফার্নান্দো। নিজের সঙ্গীদের দিকে সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে উঠতে ইশারা করল। দলবল নিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল ও।

অনুসরণ করার জন্য উঠে দাঁড়াল পাশা। পিছন থেকে আরেকটা মজার মন্তব্য কানে এল। ঘরের সবাইকে শুনিয়ে জোরে জোরে বলল পিরানো, 'ওই শুয়োরটা ভেবেছে কী নিজেকে! নিজেই একদিন ভাগাড়ে মরে পড়ে থাকবে, এই আমি বলে রাখলাম, দেখো! আর চারপাশে যে হারে গুজব শোনা যাচ্ছে, সেই দিনটি আসতে খুব বেশি বাকি নেই।' আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল দাড়িওয়ালা লোকটি। 'কর্তৃপক্ষ সতর্ক হয়ে গেছে, ওর জাহাজের দিকে নজর পড়েছে ওদের, কী হচ্ছে ওটাতে জানতে চায়।'

'থামো!' উদ্বিগ্নকণ্ঠে সতর্ক করল ক্যাথি। 'দেখো, কথা খুব বেশি বলো তুমি। বিপদে যে পড়বে, সে-হুঁশও থাকে না।'

'আরে রাখো,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে উড়িয়ে দিল যেন পিরানো।

বিল্ডিঙের সামনের দরজার দিকে চোখ পড়ল পাশার। একটা দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে থাকতে দেখল ও তাকিয়ে থাকতে

থাকতেই আস্তে করে বন্ধ হয়ে গেল ফাঁকটা। বোঝা গেল, কেউ ওখানে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে শুনছিল।

'আমি যা বলছি ঠিকই বলছি, পিরানো,' ক্যাথি বলল। 'এ সব কথার একটি বর্ণও যদি ফার্নান্দোর কানে যায়, তোমাকে আস্ত রাখবে না।'

'ওই শয়তানটাকে আমি ডরাই মনে করেছ?' দম্ভ করে বলল পিরানো। 'এক হাতে ওর চেয়ে বড় বড় মাস্তানকে কাবু করে দিতে পারি।' কাপের কফির তলানিটুকু চুমুক দিয়ে শেষ করে উঠে দাঁড়াল ও। পা টানতে টানতে বেরিয়ে গেল রেস্টুরেন্ট থেকে।

ভ্রূকুটি করল পাশা। বাঁয়ে মোড় নিয়ে হেঁটে চলল নাবিক, দুনিয়ার কোন দিকে খেয়াল নেই, জোরে শিস দিতে দিতে চলেছে। নিঃশব্দে লোকটার পিছনে চলে এল পাশা।

সরু একটা নির্জন গলির মুখে ঢুকছে পিরানো। পিছন থেকে এক হাতে পাশা ওর চুল খামচে ধরে আরেক হাতে এক কনুই চেপে ঠেলতে ঠেলতে গলির ভিতরে নিয়ে গেল, ধাক্কা দিয়ে ফেলল একটা দেয়ালের ওপর।

পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল পিরানো। ছায়ার অস্পষ্ট আলোয় মৃদু ঝিলিক দিল একটা ছুরির ফলা। গর্জে উঠল, 'ফার্নান্দো, শুয়োর কোথাকার...' পাশাকে দেখে চমকে থেমে গেল ও। ওর হাত থেকে ছুরি কেড়ে নিচ্ছে না দেখে আরও অবাক হলো। 'কে তুমি? এসবের মানে কী?'

'কথা বলতে চাই তোমার সঙ্গে,' পাশা বলল।

'কথা, না!' পিরানো বলল। 'কী কথা? দেখো, যে-ই হও তুমি, জলদি সরো আমার সামনে থেকে, যদি নিজের ভুঁড়ি ফাঁসানো

নিজের চোখে দেখতে না চাও।'

দুই হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল পাশা। 'আমার মনে হলো গ্রিফিথের ক্যাপ্টেন ফার্নান্দোকে পছন্দ করো না তুমি।'

ঘাড়টাকে মুরগির মত কাত করে তাকাল পিরানো। 'সেটা কি কোন গোপন কথা? কিন্তু তাতে তোমার কী? তুমি কী চাও?'

'তুমি বলছিলে, ফার্নান্দোর জাহাজে অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে। কী, সেটা আমি জানতে চাই।'

'কেন?' পিরানো জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

'আমি ফেডারেল গভর্নমেন্টের কাজ করি,' কী-ওয়েস্টের পিন্টোকে যা বলেছিল পাশা, পিরানোকেও তা-ই বলল।

'ফেড!' তাড়াতাড়ি ছুরি নামাল পিরানো। 'সত্যি? এখানে যা ঘটছে, সেটার তদন্ত করছ?'

'কী ঘটছে?'

যখন বুঝল, ওকে মারবে না পাশা, আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল পিরানোর আচরণ। ছুরি ঘোরাতে ঘোরাতে হাসল। বলল, 'অনেক কিছু, মিস্টার। বিশ্বাস করো। আমি সব জানি। কিন্তু বললে আমার লাভটা কী? আমাকে কত দেবে?'

হাসি চাপতে পারল না পিরানো। 'বাহ্, দারুণ তো। আমি তোমাকে এত এত তথ্য দেব, বিনিময়ে কিছুই পাব না? কয়েক শো ডলারের তথ্য, বুঝলে। তুমি আমাকে অল্প কিছু দাও, তাতেই সব বলে দেব।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল পাশা। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি ফার্নান্দোর শাস্তি চাও। কিন্তু ভুল করেছি।' শ্রাগ করে ঘুরে দাঁড়াতে গেল ও।

'দাঁড়াও!' পিরানো বলল। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। ভ্রূকুটি করল। তারপর ছুরিটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল। 'বেশ, তুমিই জিতলে। তবে আমার মত একজন ভালমানুষকে এভাবে ঠকানো উচিত হচ্ছে না তোমার। যাকগে, আসল কথায় আসা যাক।' উসখুস করছে ও।

'হয় বলো, নইলে গেলাম।'

ইটের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল পিরানো। 'ঘটনার শুরু দু'বছর আগে। তখন কলাম্বিয়ার এক কোটিপতি লোক গ্রিফিথ জাহাজটা কিনে নিয়ে, পুরানো ক্যাপ্টেনকে লাথি মেরে তাড়িয়ে–আমার ভাল বন্ধু ছিল ওই ক্যাপ্টেন–ফার্নান্দোকে ক্যাপ্টেন বানাল। সবাই জানে, ফার্নান্দোর মত খারাপ লোক হয় না। তাই যখন শুনলাম, ওরা মাদকচক্রে জড়িয়ে গেছে, অবাক হইনি।'

হতাশ মনে হলো পাশাকে। তথ্য চায় ও, গুজব নয়।

'তারপর গ্রিফিথ যখন এক মাসের জন্য গায়েব হয়ে গেল,' পিরানো বলছে, 'বুঝলাম, গুজবটা সত্যি। আর্জেন্টিনার সেই লোকটার মর্মান্তিক পরিণতি...'

'এক সেকেণ্ড,' বাধা দিল পাশা। 'এতবড় একটা জাহাজ গায়েব হয় কী করে? কী বোঝাতে চাইছ তুমি?'

জবাব দিতে মুখ খুলল পিরানো। হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল ও, বড় বড় হয়ে গেল চোখ। 'সাবধান!' চিৎকার করে বলল, 'তোমার পিছনে!'

ছয়

ঘুরতে শুরু করল পাশা। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। পিছন থেকে দু'তিন জন ভারী শরীরের লোক ওর গায়ের ওপর এসে পড়ল। ধাক্কা দিয়ে ফেলল পাকা রাস্তায়।

পড়ে যাওয়ার ধকল কাটানোর আগেই কাঁধে ও পিঠে বেশ কিছু ঘুসি খেল পাশা। একজন লোক ওকে ঘুরিয়ে চিত করল। প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল চোয়ালে।

পাল্টা আঘাত হানল পাশা। লোকটা আবার ঘুসি তুলতেই এক পায়ের গোড়ালি দিয়ে ওর তলপেটে লাথি মারল। অন্য পা দিয়ে লাথি মারল আরেকজনকে। তৃতীয় আরেকজন পকেট থেকে একটা ব্ল্যাকজ্যাক বের করে বাড়ি মারার জন্য উঁচু করল।

মুহূর্তে গড়িয়ে একপাশে সরে গেল পাশা, কানের পাশ দিয়ে চলে

গেল ব্ল্যাকজ্যাকটা। পরক্ষণে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। জঙ্ঘায় লাথি খেয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ল লোকটা, ওর চোয়াল পাশার নাগালে চলে এল, থুঁতনির নিচে প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে ঝাঁকি দিয়ে আবার পিছনে সরে গেল মাথাটা।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য মুক্ত হলো পাশা। চোখের কোণ দিয়ে দেখল আরও দুজনের সঙ্গে লড়াই করছে পিরানো। রুক্ষ চেহারার লোকগুলোর সবার পরনেই নাবিকের পোশাক। পিরানোকে সাহায্য করতে যাবার আগেই আবার পাশাকে ঘিরে ফেলল বাকি তিনজন। কঠিন হয়ে গেছে চেহারা। নীরবে ছড়িয়ে পড়ে সাবধানে এগোচ্ছে। ব্ল্যাকজ্যাকওয়ালা লোকটা উঁচু করে ধরেছে মারাত্মক অস্ত্রটা।

গলির মুখে আরও একজনকে ঢুকতে দেখা গেল এ সময়। ক্যাপ্টেন ফার্নান্দো। মুখে বিকৃত হাসি। দুই হাত পকেটে। নিজের লোকদের উদ্দেশ্যে ধমকে উঠল, 'কী, কাজ সারতে পুরো রাত কাবার করবে নাকি!'

পিস্তল বের করল না পাশা। লোকগুলো ওকে খুন করতে আসেনি, শুধু কাবু করতে চায়। খুন করতে চাইলে পিস্তল কিংবা ছুরি বের করত। পিরানোকে পিটিয়ে আধমরা করে একটা শিক্ষা দিতে চায় ফার্নান্দো। পাশা যেহেতু পিরানোর সঙ্গে রয়েছে, তাই ওকেও পেটাচ্ছে।

সমানে হাত-পা ব্যবহার করছে পিরানো। পাশাকে আক্রমণ করেছে যে তিনজন, পরস্পরের দিকে তাকাল একবার ওরা, তারপর আবার হামলা চালাল। একজন ওকে ঘুসি মারল। সেটা ঠেকিয়ে পাল্টা ঘুসি মারল পাশা। ওর চাঁদি লক্ষ্য করে শিস কেটে

ছুটে আসছে ব্ল্যাকজ্যাকটা। হাত তুলে বাহু উঁচু করে ওটা ঠেকাল পাশা। প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল লোকটার কানে। চিৎকার দিয়ে পিছিয়ে গেল লোকটা।

তৃতীয় লোকটা দুজনের মধ্যে চালাক। পাশার নজর সামনের দুজনের ওপর থাকতে থাকতে পিছনে চলে এল ও। পিছন থেকে গলা পেঁচিয়ে ধরে এত জোরে হ্যাঁচকা টান মারল, পাশার মনে হলো ওর ঘাড় ভেঙে যাচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে গেল। শ্বাস নিতে পারছে না।

'এবার কোথায় যাবে, দোস্ত!' কানের কাছে হাসি হাসি কণ্ঠে বলল লোকটা। কিন্তু পাশাকে চেনে না ও। জুডোর সাধারণ এক প্যাঁচেই সামনে চলে এল পিছনের লোক, পরক্ষণে উড়ে গিয়ে পড়ল রাস্তায়।

সামলে নিয়েছে ব্ল্যাকজ্যাকওয়ালা লোকটা। হাতের অস্ত্র তুলে এগোল। আবার বাড়ি মারল পাশার মাথা সই করে। পাশে সরে গেল পাশা। লোকটার কব্জি চেপে ধরে জুডোর প্যাঁচ কষল। ডিগবাজি খেয়ে গিয়ে দেয়ালে বাড়ি খেল লোকটা। প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে গেল রাস্তায়।

এরপর সাবধান হয়ে গেল বাকি দুজন। পাশাকে সহজ টার্গেট ভাবল না আর। ওর ক্ষমতা জানা হয়ে গেছে ওদের। দ্বিতীয়বার আর ওর ঘুসির স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছে নেই। দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল পাশা। বাধা দিতে প্রস্তুত। ঠিক এ সময় খসখসে কণ্ঠের আদেশ শুনে স্থির হয়ে গেল।

'অনেক হয়েছে, ফেড,' ফার্নান্দোও পাশাকে ফেডারেল গভর্নমেন্টের লোক ভেবেছে। 'এবার থামো, যদি তোমার সঙ্গীকে

ওর স্রষ্টার কাছে পাঠাতে না চাও।'

গলির মুখ থেকে সরে এসেছে ফার্নান্দো। এক হাঁটু চেপে রেখেছে রাস্তায় চিত হয়ে পড়া পিরানোর বুকে। দুদিক থেকে দুহাত ধরে রেখেছে গ্রিফিথের দুজন নাবিক। একটা ছোরার মাথা পিরানোর গলায় ধরে রেখেছে ফার্নান্দো। চামড়া কেটে রক্ত বেরোচ্ছে। নড়ছে না পিরানো। বেহুঁশ হয়ে গেছে বোধহয়।

দুই হাত উঁচু করল পাশা। পিস্তলটা বের করার কথা ভাবছে। কিন্তু এখন আর সুযোগ নেই। ছোরাটা যেভাবে ধরেছে ফার্নান্দো, পাশা পিস্তল বের করার আগেই পিরানোর গলার শিরা কেটে দেবে। একজন নিরপরাধ মানুষের খুনের দায় নিতে রাজি নয় পাশা।

'বুদ্ধিমান লোক তুমি,' ক্যাপ্টেন বলল। পাশার কাছে দাঁড়ানো দুজন লোকের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল।

একটা ছুরির মাথা ঠেসে ধরা হলো পাশার পাঁজরে। ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইল পাশা। ওর দেহতল্লাশী করে বেরেটা আর এক গোড়ালির ওপরে বাঁধা থ্রোইং নাইফটা বের করে নেয়া হলো। তারপর ওর পিস্তল তাক করেই ওকে কথা শুনতে বাধ্য করা হলো।

ব্ল্যাকজ্যাকওয়ালার গোঙানি শোনা গেল। ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করতে এগোল ওর একজন সঙ্গী। পিরানোর হাত ধরে রেখেছিল যারা, তারাও উঠে পিছিয়ে গেল।

তবে, ফার্নান্দো উঠল না। ঠাস করে চড় মারল পিরানোর এক গালে। 'এই, চোখ মেলো, তাকাও এদিকে! দেখো, তোমাকে কী করি!'

'না!' চেঁচিয়ে উঠে লাফ দিতে গেল পাশা।

নড়ে উঠল পিস্তলটা। নলের মুখ ওর দুই চোখের মাঝখানে স্থির হলো।

থেমে গেল পাশা।

'এসব থেকে সরে থাকো, ফেড,' ভোঁতাস্বরে বলল ফার্নান্দো। 'এটা আমাদের দুই দোস্তের ব্যাপার। এর মাঝে আর তুমি ঢুকো না।' আবার পিরানোর গালে চড় মারল ও।

কয়েকবার চোখ মিটমিট করে পাতা মেলল পিরানো। কী ঘটছে, বুঝতে পেরে হিসিয়ে উঠল, 'সরো আমার ওপর থেকে, শয়তান কোথাকার! তোমার মত শুয়োরের ছোঁয়া গায়ে লাগাতেও ঘেণ্না করে!'

বদলে গেল ফার্নান্দোর চেহারা। ভয়ঙ্কর এক শয়তানে রূপ নিল যেন। 'আবর্জনা ছুঁয়ে হাত ময়লা করার কোন ইচ্ছে আমারও নেই!'

'তোমার মত কাপুরুষের সঙ্গে কথা কী! যে নিজে মুখোমুখি না হয়ে মানুষের ওপর তার কুত্তা লেলিয়ে দেয়!' গলায় চেপে থাকা ছোরার নিচ থেকে গলা সরানোর চেষ্টা করল পিরানো। না পেরে থুতু দিল ফার্নান্দোর মুখে। 'নাও! এতে তোমার ময়লা সামান্য সাফ হলেও হতে পারে!'

'চিরকালই তুমি বোকা থেকে গেলে, পিরানো,' বলেই ছুরি দিয়ে ওর গলায় পোঁচ মারল ফার্নান্দো।

কয়েকবার ঝাঁকি দিয়ে স্থির হয়ে গেল পিরানোর দেহ। ছোরার রক্ত ওরই কাপড়ে মুছে নিয়ে পকেটে ঢোকালো ফার্নান্দো। পাশার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার কথা না শুনলে তোমারও এই অবস্থাই করা হবে। এখন জাহাজে চলো।'

ইশারা করল ফার্নান্দো। চারপাশ থেকে পাশাকে ঘিরে ফেলল নাবিকেরা। পিস্তলের নলের মুখ ওর মেরুদণ্ডে ঠেসে ধরা হলো। যে লোকটা ওর পিঠে পিস্তল ধরেছে সে ওর গলা পেঁচিয়ে ধরল। পাশা কী রকম বিপজ্জনক, বুঝে গেছে ওরা। তাই কোনরকম ঝুঁকি নিল না। কয়েকটা ছুরি বিভিন্ন দিক থেকে ওর গায়ে চেপে ধরা হলো।

গলি থেকে বেরিয়ে এল ওরা। আগে আগে চলেছে ফার্নান্দো। গলি থেকে মূল রাস্তায় বেরিয়ে পাশার গা ঘেঁষে এল নাবিকেরা। উঁচু স্বরে গান গাইতে গাইতে জড়াজড়ি করে চলল। লোকে ভাববে, মাতাল হয়ে জাহাজে ফিরে যাচ্ছে নাবিকের দল। চালাকিটা কাজে লাগল। গ্রিফিথে যাওয়ার পথে দ্বিতীয়বার কেউ ওদের দিকে নজর দিল না। পানির কিনারে জাহাজের কাছাকাছি এসে একজন দাড়িওয়ালা লোক ফার্নান্দোর পথ আগলে দাঁড়াল। গল গল করে পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে জানতে চাইল, মালবাহী এই জাহাজটা কখন ছাড়বে, আর কখন পৌঁছবে দক্ষিণ আমেরিকায়। জবাব দেয়ার সময় সামান্যতম গলা কাঁপল না ফার্নান্দোর। লোকটা কি বরফের টুকরো নাকি–অবাক হয়ে ভাবল পাশা–এত শীতল থাকে কী করে! গ্যাংওয়ে দিয়ে ঠেলে পাশাকে ফোরডেকে নিয়ে আসা হলো। ও বুঝতে পারল, জাহাজের সব নাবিক না হলেও অনেকেই মাদকচক্র দলের লোক। ডেকের নিচে এনে, সরু একটা কম্প্যানিয়নওয়ে দিয়ে ওকে ছোট একটা ঘরের সামনে আনা হলো। কালো চামড়ার একজন নাবিক ওকে ধাক্কা দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দড়াম করে দরজা লাগাল। বাইরে থেকে তালায় চাবি লাগানোর শব্দ কানে এল পাশার।

নাবিকরা চলে যেতেই এক মুহূর্ত দেরি না করে এই বন্দিশালা থেকে বেরোনোর পথ খুঁজতে শুরু করল ও। কিন্তু কোন উপায়ই দেখল না। বাল্কহেড তৈরি হয়েছে নিরেট ধাতব চাদর দিয়ে–সাধারণত যা করা হয়। বাজুকা ছাড়া অন্য কোন কিছু দিয়ে ওটাতে চিড় ধরানোও কঠিন। তালা দেয়া দরজাটা আর ছোট একটা পোর্টহোল বাদে আর কোন ধরনের ফোকর নেই।

ঘরে আসবাব বলতে একটা বিছানা, একটা টেবিল আর একটা চেয়ার। বিছানার কিনারে বসে পুরো পরিস্থিতিটা খতিয়ে দেখল পাশা। বন্দরের মাটিতে ওকে খুন করেনি ফার্নান্দো, কিন্তু খোলা সাগরে নিয়ে গিয়ে যে করবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তার আগেই মুক্তির উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

এক ঘণ্টা পেরোল। মাথার নিচে দুই হাত দিয়ে বিছানায় চিত হয়ে আছে পাশা। আর দু'ঘণ্টার মধ্যেই হাণ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা ওর। পাশার তরফ থেকে কোন সাড়া না পেলে সন্দিহান হয়ে উঠবে ও, তখন হয়তো উদ্ধারকারী দল পাঠাবে। কিন্তু পাশার দুর্ভাগ্য, ও কোথায় গেছে, কিছুই বুঝতে পারবে না ওরা, কারণ কোন সূত্র রেখে আসেনি ও। অনন্তকাল খুঁজেও কোনই হদিস করতে পারবে না ওরা।

আবার তালায় চাবি ঢোকানোর শব্দ হলো। জোরে ঠেলা লেগে ভিতরের দিকে সরে এল দরজার পাল্লা, দড়াম করে বাড়ি খেল পাশের দেয়ালে। ফার্নান্দো ঢুকল ঘরে। সঙ্গে দুজন পিস্তলধারী বডিগার্ড, পাশার বেরেটাটা একজনের হাতে।

চেয়ারের পায়ায় জুতোর ডগা বাধিয়ে কাছে টেনে নিল ক্যাপ্টেন। বসতে বসতে বলল, 'তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার।'

'বলো।' স্বর নরম করল না পাশা, যতই আন্তরিক ভঙ্গিতে কথা বলুক না কেন ফার্নান্দো। ও জানে, সব ভণ্ডামি। আগে হোক পরে হোক, ফার্নান্দো ওকে খুন করবে।

'তোমাকে ফেড বলে ডাকলে কেমন হয়?' হাসল ফার্নান্দো। দুই হাত হাঁটুতে রাখা। 'আমার হাতে সময় বেশি নেই। জাহাজ ছাড়ার পর অবশ্য কথা বলার প্রচুর সময় পাব। আর তখন তুমি তোমার সব কথা বলবে আমাকে, ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক।'

'অত শিওর হয়ো না,' পাশা বলল।

না শোনার ভান করল ফার্নান্দো। 'এখন বলো, কোন এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত তুমি? আমাদের কথা জানল কী করে ওরা? কতখানি জেনেছে?'

পিরানোর কথায় যতখানি আন্দাজ করেছে, তার ওপর ভিত্তি করে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করল পাশা, 'সব জানি। গ্রিফিথের নতুন মালিক কে, পুরো একটা মাস জাহাজটা কোথায় গায়েব হয়ে ছিল, আর্জেন্টিনা থেকে এসেছিল যে লোকটা, তার কথা, সব জানি।'

দম বন্ধ করে ফেলল এক পিস্তলধারী।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত একেবারে চুপ করে রইল ক্যাপ্টেন, মুখের একটা পেশিও নড়াল না। ওর ধোঁকাবাজিটা বোধহয় বিফলে গেল, ভাবতে আরম্ভ করল পাশা। হঠাৎ কথা বলে উঠল ফার্নান্দো, ওর কণ্ঠে সামান্য উত্তেজনার আভাস, 'তাই। তাহলে তো আমি যা অনুমান করেছি, তারচেয়ে বেশি জানো তুমি। ফেলিডাই শুনলে ভীষণ রাগ করবে। ল্যানোসার খুন আর অন্যান্য যে সব তথ্যর কথা বলছ, নিশ্চয় কোনও ইনফর্মারের কাছে শুনেছ। ওকেও ছাড়বে না ফেলিডাই।'

ফেলিডাই। নিশ্চয় এই মাদকচক্রের রিং লিডারের ছদ্মনাম, কিংবা ডাক নাম। এক ধোঁকাতেই এত তথ্য পেয়ে যাবে কল্পনাই করেনি পাশা। মালবাহী জাহাজটা মাসখানেক গায়েব থাকার কারণ নিশ্চয় কোনও গোপন ডকে তোলা হয়েছিল ওটাকে, ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য। আর ওই আর্জেন্টিনীয় যুবক ল্যানোসা দুর্ঘটনায় মারা যায়নি, ওকে খুন করা হয়েছে। সাবধানে কথা বলতে হবে এখন। মুখ ফসকে বেফাঁস কিছু বলে বসলে সব ভেস্তে যাবে। বলল, 'ওই খুনের তদন্ত করতে করতেই তোমাদের কাছে পৌঁছে গেছি আমরা।'

'তাই?' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল ফার্নান্দো। 'আমি ভেবেছিলাম ওর কব্জির সামান্য দাগগুলো কারও চোখে পড়বে না। ওকে মাস্তুলে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়ার আগে তোয়ালে ছিঁড়ে ফালি করে ওর কব্জি বেঁধেছিলাম।' কঠিন হয়ে গেছে ক্যাপ্টেনের মুখ। 'গাধা কোথাকার! আমাকে বলা হয়েছিল ওকে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু আমাদের সম্পর্কে সব জানার সঙ্গে সঙ্গে পরের বন্দরে নেমে পুলিশকে জানানোর বোকামিটা করে বসল।'

পাশা বুঝল, বেশির ভাগ নয়, এই জাহাজের সব নাবিকই মাকদচক্রের সঙ্গে জড়িত। তারমানে মুক্তি পেতে চাইলে বিশ-বাইশজন মানুষের মুখোমুখি হয়ে ওদের পরাস্ত করতে হবে ওকে, যাদের কাউকেই নিরীহ ভেবে অবহেলা করা চলে না। এভাবে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

'তবে তোমার ব্যাপারে এই বোকামিটা করব না আমরা। সাবমেরিনটাকে তুলে নেয়ার পর তোমাকে কয়লার বস্তার সঙ্গে বেঁধে পানিতে ফেলে দেব হাঙরে খেয়ে ফেলবে। কিছুদিন অন্তত

ফেডারেলদের উৎপাত থেকে রেহাই পাব।'

'কিন্তু আমাকে মেরে তোমাদের সমস্যার সমাধান হবে না,' পাশা বলল। 'খুব শীঘ্রি ফেলিডাইকে ধরে জেলে পোরা হবে।'

ঠোঁট কোঁচকাল ফার্নান্দো। 'আমার তা মনে হয় না। সাব-পেনের খোঁজ যদি পেয়েও যায় তোমাদের সরকার, ফেলিডাইকে জেলে ঢোকানো এত সহজ হবে না। জায়গাটা একটা দুর্গ। আর আমেরিকান মিলিটারীকে কোনমতেই নিজের দেশে ঢুকতে দেবে না কলাম্বিয়ান সরকার।'

তথ্যের পর তথ্য, মনে মনে চমৎকৃত হচ্ছে পাশা। এখন সমস্যাটা হলো, এগুলো হান্টারের কাছে পাচার করা নিয়ে। কীভাবে করা যায়? ফার্নান্দোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। জানো তো, ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়।'

উঠে দাঁড়াল ফার্নান্দো। কুঁচকে গেছে ভুরু। 'তুমি আমাকে ভাবনায় ফেলে দিলে, ফেড, স্বীকার করতে লজ্জা নেই। আবার কথা বলব আমরা। ততক্ষণ কোন ধরনের বোকামির চেষ্টা কোরো না। তোমার নিজের ভালর জন্যই বলছি।'

আবার দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল পাল্লাটা। একা রেখে যাওয়া হলো পাশাকে। গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত। ধীরে ধীরে মাদক চোরাচালান চক্রের পুরো ব্যবস্থাটা পরিষ্কার হয়ে আসছে ওর কাছে।

বিড়াল পরিবারের প্রাণীকে ফেলিডাই বলে। রিং লিডারের ছদ্মনাম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আসল নাম প্রচার করে বেড়াবে না। সে যে-ই হোক, সারা দুনিয়াটাকে মাদক দিয়ে সয়লাব করে ফেলার

পরিকল্পনা নিয়েছে।

নিজের সংগ্রহে অন্তত দুটো মিনি-সাবমেরিন যে রয়েছে ওর, ইতিমধ্যেই এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। আকারের কথা যা শোনা গেছে, তাতে অনুমান করা যায়, প্রতিটিতে কম করে হলেও দুই টন কোকেইন বহন করতে পারে।

প্রতি তিরিশ দিনে আমেরিকায় দু'বার যাতায়াত করে গ্রিফিথ। একেকবারে একেকটা সাবমেরিন থেকে দুই টন করে কোকেইন নিলে মাসে হয় চার টন, আর দুটো থেকে ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে রেখে আসে কম করে আট টন পাউডার; নিয়মিত মাদকের সরবরাহ পেতে থাকে ওখানকার মাদকসেবীরা। ভয়াবহ ব্যাপার। এখনই ফেলিডাইকে ঠেকাতে না পারলে আরও মারাত্মক হয়ে উঠবে পরিস্থিতি। সাব-পেন। পাশার মনে হচ্ছে, শুধু দুটো নয়, আরও মিনি-সাবমেরিনকে মাদক পাচারে লাগানো হতে পারে, যদি ইতিমধ্যেই লাগিয়ে ফেলা না হয়ে থাকে। মিনি-সাব বাহিনী!

সমস্ত সাবমেরিনগুলোকে ওরা কাজে লাগাতে পারলে কোকেন বন্যা ঠেকানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। দুনিয়ার সব দেশের সরকারই অসহায় হয়ে যাবে। বাংলাদেশের অবস্থাও ভাল কিছু হবে না। কারণ এখানেও নেশায় আসক্ত হওয়া মানুষের সংখ্যা বাড়বে, রেহাই পাবে না কিশোর ছেলেমেয়েরাও, বিশেষ করে ছেলেরা।

মনে মনে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ফেলল ও, ফেলিডাইকে ঠেকাবেই। জাহাজ থেকে নেমে যেতে হবে ওকে, যে কোনভাবেই হোক, তারপর হান্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব কথা জানাবে ওকে।

নতুন কোন ঘটনা ছাড়াই পার হলো রাতটা। আর কেউ দেখা

করতে এল না পাশার সঙ্গে। সূর্য ওঠার সামান্য পরে সাদা অ্যাপ্রন পরা একটা লোক ট্রে-তে করে খাবার নিয়ে এল। পিস্তলধারী দুজন বডিগার্ড এল ওর সঙ্গে, যাতে পাশা পালানোর চেষ্টা না করতে পারে। টেবিলে খাবার রাখল অ্যাপ্রন পরা লোকটা।

না খেয়ে থাকার কোন মানে হয় না। বরং পালাতে চাইলে শক্তি বজায় রাখা দরকার। নির্দ্বিধায় খেতে শুরু করল পাশা।

খাওয়া শেষ হলে ট্রে নিয়ে চলে গেল লোকগুলো। একটু পরেই দরজাটা খুলে গেল আবার। ঘরে ঢুকল ফার্নান্দো। এবার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল অস্ত্রধারী বডিগার্ড দুজন।

'গুড মর্নিং, ফেড,' হাঁসি হাঁসি কণ্ঠে বলল ক্যাপ্টেন। 'আশা করি খাবার ভাল লেগেছে।'

'মৃত্যুদণ্ড দেয়া মানুষকে শেষ আনন্দ দিলে নাকি?' পাশা প্রশ্ন করল।

'নাহ্, এতটা বর্বর নই আমরা। তোমাকে সাগরে ডোবাতে আরও চার-পাঁচ দিন বাকি আছে। অকারণে এ ক'টা দিন তোমাকে না খাইয়ে রাখার কোন যুক্তি নেই।'

এটাই কি আসল কারণ? পাশা ভাবছে। নাকি খাবার খাইয়ে খাইয়ে অভ্যাস করে ওকে অসতর্ক করে তুলছে, যাতে সময়মত ঘুমের বড়ি কিংবা দেহ অবসকারী কোনও ওষুধ মিশিয়ে দিলেও সন্দেহ না করে খেয়ে ফেলে ও? পানিতে মিশিয়ে দিতে পারে। পানি না খেয়ে পারবে না। তৃষ্ণা মেটানোর জন্য খেতেই হবে। তবে পানিতে গন্ধ পাওয়া যেতে পারে। তাই কফিতে মেশানোর কথাই ভাববে প্রথমে ওরা। কফির তেতো স্বাদ ওষুধের স্বাদকে

সহজেই ঢেকে দেবে।

'বিশ মিনিটের মধ্যেই রওনা হব আমরা,' ফার্নান্দো বলল।

এমনিতে লোকটার সঙ্গে কথা বলারই রুচি নেই পাশার। কিন্তু বললে হয়তো কাজ হবে। ফার্নান্দো যদি ভাবে, পাশা একেবারে পোষা বিড়াল ছানা হয়ে গেছে, কথা বলে ওকে নরম করে এখান থেকে বেরোতে চায়, লোকটাকে অসতর্ক অবস্থায় পাওয়ার সম্ভাবনা আছে পাশার। 'আশা করি ভুলটা বুঝতে পেরেছ, তাই না? অহেতুক ঝামেলা না করে পুলিশে ধরার আগেই নিজেকে ওদের হাতে তুলে দিতে চাও।' হাসল ফার্নান্দো। 'তুমি আমাকে অবাক করছ, ফেড। জেরা করে তোমার মুখ থেকে কথা আদায়ের সময়ও এমন রসিকতার মেজাজে থাকতে পারবে কি না, ভাবছি।' যাওয়ার জন্য ঘুরল ও।

'শোনো, ইচ্ছে করলে সরকারের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে পারো,' পাশা বলল।

থেমে গেল ফার্নান্দো। একবার দরজার দিকে তাকিয়ে কণ্ঠস্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী ধরনের সমঝোতা?'

শ্রাগ করল পাশা। 'সেটা তো আমি বলতে পারব না। তবে ফেলিডাইয়ের বিরুদ্ধে যদি কথা বলো, কর্তৃপক্ষ হয়তো তোমার শাস্তির মেয়াদ কমিয়ে দিতে পারে; হয়তো মৃত্যুদণ্ড বন্ধ করে সাধারণ জেল দিতে পারে।'

'ফেলিডাইয়ের সঙ্গে বেইমানি?' মাথা নাড়ল ফার্নান্দো। 'নো, থ্যাংকস, ফেড, এত তাড়াতাড়ি মরার কোনও ইচ্ছেই আমার নেই।'

দড়াম করে লেগে গেল পাল্লাটা। কান পেতে রয়েছে পাশা। ওপরের ডেকে নাবিকদের নড়াচড়া আর ব্যস্ততা বোঝা যাচ্ছে শব্দ শুনেই। জাহাজ ছাড়তে তৈরি ওরা। কর্কশ কণ্ঠে হুকুম শোনা গেল। নোঙর তোলার সময় শিকলের ঝনঝনাৎ শব্দ। কিছুটা সময় ওর কথা নিশ্চয় একেবারেই ভুলে গেছে স্মাগলাররা, পাশা ভাবল। মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে বিছানার নিচটা পরীক্ষা করল ও। রাতে যতবারই পাশ ফিরতে গেছে, ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করেছে বিছানা। গদির নিচে বক্স স্প্রিং লাগানো রয়েছে, আগেই সন্দেহ করেছিল। ওকে একেবারে বাড়ির আরাম দেয়ার ব্যবস্থা করেছে ওরা, অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে একটা স্প্রিঙের কয়েলের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে দিল ও। মোটা, শক্ত স্প্রিং, আঙুল দিয়ে বাঁকানো অসম্ভব। মোড়ামুড়ি করে দেহটাকে বিছানার আরেকটু নিচে নিয়ে এল ও। বক্স স্প্রিঙের ধারগুলোয় আঙুল চালিয়ে ভালমত দেখল। ঠিক মাঝখানে যেখানে চাপ সবচেয়ে বেশি পড়ে সেখানে দুই টুকরো হয়ে গেছে একটা স্প্রিং। প্রচুর কসরত আর টানাহেঁচড়া করে ওটাকে ভেঙে খুলে নিয়ে এল। তারপর সোজা করায় মনোযোগ দিল।

ইস্পাতের শক্ত স্প্রিঙের কয়েল খুলে সোজা করা খুবই কষ্টকর কঠিন কাজ। প্রচুর সময় দরকার। সময়ের অভাব নেই আমার, নিজেকে বোঝাল ও। কাজ করে গেল। যখনই কাছাকাছি পায়ের শব্দ শোনে, থেমে যায়।

সেদিন দুপুরের কিংবা সন্ধ্যার খাবার নিয়ে এল না কেউ। পরদিন সকালে নাস্তা দিয়ে গেল সেই একই বাবুর্চি। বিকেলের দিকে এল

ফার্নান্দো। ততক্ষণে কয়েলটা সোজা করে ফেলেছে পাশা। দুই ফুট লম্বা একটা তার লুকানো আছে এখন ওর গদির নিচে।

চিন্তিত দেখাচ্ছে ক্যাপ্টেনকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পাশার দিকে তাকিয়ে থেকে চেয়ারে বসল। 'আমি ভেবেছিলাম, তুমি মিথ্যে বলছ।'

'কোন ব্যাপারে?' পাশার প্রশ্ন।

'সব ব্যাপারেই। আমাদের নেটওঅর্কের সঙ্গে ল্যানোসার মৃত্যুটাকে কোনভাবেই যুক্ত করতে পারার কথা নয় সরকারি কর্তৃপক্ষের। বড় জোর, সাধারণ একটা হত্যাকাণ্ড হিসেবে ধরে নিতে পারে। তার বেশি না।'

চুপ করে রইল পাশা। লোকটা আর কী বলে, শোনার অপেক্ষা করছে।

'কিন্তু এখন আমি আর ততটা শিওর নই,' ফার্নান্দো বলল। 'আমি জেনেছি, আমাদের একজন স্থানীয় অপারেটরকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে...'

দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে বলে উঠল পাশা, 'কী-ওয়েস্টে।'

রীতিমত চমকে গেল ফার্নান্দো। 'তুমি জানো? তারমানে যতটা ভেবেছি, অবস্থা তারচেয়েও খারাপ।'

'সমঝোতায় আসার সময় এখনও ফুরিয়ে যায়নি।' পাশা বলল। যদিও লোকটা ওর প্রস্তাব মেনে নেবে, আশা করছে না। তবে ওকে কিছু করার আগে দ্বিতীয়বার ভাববে এখন লোকটা। যত দেরি করবে, যত সময় নেবে ও, পাশার জন্য ততই ভাল।

উঠে দাঁড়িয়ে দরজার সামনে পায়চারি শুরু করল ক্যাপ্টেন। দুই হাত পিছনে [illegible] যেন পাশাকে নয়, নিজেকেই

বোঝাচ্ছে ও, 'নিজেকে আর আমার অধীনে যারা কাজ করে তাদের বাঁচাতে এই পদক্ষেপই নিতে হবে আমাকে।'

বাংকের কিনারে পা ঝুলিয়ে বসল পাশা। ফার্নান্দো ওর দিকে পিছন দিলে গদির নিচ থেকে তারটা বের করে ব্যবহার করার কথা ভাবল একবার, পরক্ষণেই বাতিল করে দিল চিন্তাটা। ক্যাপ্টেনের কাছে পৌঁছানোর আগেই ওকে ঝাঁঝরা করে দেবে গার্ডরা।

পোর্টহোলের দিকে ইশারা করল ফার্নান্দো। 'মাত্র পাঁচ থেকে সাত নট গতিতে চলেছি আমরা, নিশ্চয় খেয়াল করেছ। রাত যখন নামবে, তখনও কী-এর সীমানার মধ্যেই থাকব।' পায়চারি থামাল ও। 'সারাদিন চুপচাপ থেকে ব্যাটারি রিচার্জ করছে সাবমেরিনটা, যাতে সন্ধ্যার পর আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারে।' এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে যোগ করল, 'ভাগ্যিস, দিনটা আজকে রোদেলা।'

কথাটার মানে বুঝতে পেরে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল পাশা, 'তারমানে মিনি-সাবগুলো সোলার পাওয়ার ব্যাবহার করে?'

আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল ফার্নান্দো। 'বাহ্, এমন তথ্যও আছে তাহলে যেটা তুমি জানো না। হ্যাঁ, ফেড। কোটি কোটি ডলার খরচ করে সাবগুলোতে রিট্র্যাক্টেবল সোলার প্যানেল লাগিয়েছে ফেলিডাই। স্পেশাল ব্যাটারির ব্যাংকে এনার্জি জমা করে রাখার ব্যবস্থা আছে। এ সব ব্যাপারে আমি বিশেষজ্ঞ নই, তারপরেও বলতে পারি, ওরকম সিসটেম এর আগে আর কোথাও ব্যবহার করা হয়নি।'

সাবমেরিন টেকনোলোজির এই অভিনব উন্নতি সাধনে ফেলিডাইয়ের ইঞ্জিনিয়ারদের কৃতিত্বে মুগ্ধ না হয়ে পারল না

পাশা। সোলার পাওয়ার এনার্জি ব্যবহার করায় অনেক ধরনের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পেয়েছে সাবমেরিনগুলো, যখন-তখন, যেখানে ইচ্ছে রিফিউয়েল করে নিতে পারে, তবে তাতে চোখে পড়ার ঝুঁকিও রয়েছে।

এ সময় মাথার ওপরে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। প্লেনের ইঞ্জিনের শব্দ।

ফার্নান্দোও লক্ষ করেছে সেটা। 'নিশ্চয় তোমার বন্ধুরা খোঁজাখুঁজি করছে, তাই না? আজ তিন-তিন বার আমাদের জাহাজের ওপর দিয়ে উড়ে গেছে একটা সিপ্লেন। খুব নিচু দিয়ে।' দরজার থাবা দিল ও। বাইরে থেকে খুলে দিল একজন গার্ড। 'তবে অকারণ সময় নষ্ট করছে। কাল সকাল নাগাদ সাগরের তলায় চলে যাবে তুমি।'

পাল্লা লাগিয়ে দিয়ে গেল ফার্নান্দো। দড়াম করে শব্দ হলো। শব্দটাকে মৃত্যুঘণ্টার মত লাগল পাশার কাছে। বাইরে পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করল ও। তারপর গদির নিচ থেকে বের করল তারটা। প্রচুর পরিশ্রম করে তারের দুই মাথায় দুটো আংটা বানাল, যাতে আঙুল ঢোকানো যায়। হাতে বানানো গ্যারট এটা, ব্যবহার করতে জানলে একটা ভয়ঙ্কর অস্ত্র। তারের এক মাথা বগলের নিচে ঢুকিয়ে তারটা হাত বরাবর লম্বা করে সোজাসুজি রাখল।

আক্রমণের জন্য প্রস্তুত এখন ও। শুধু হাতটায় সামান্য একটু ঝাঁকি, সঙ্গে সঙ্গে হাতের তালুতে চলে আসবে তারের একটা মাথা।

গড়িয়ে কাটছে সময়। বিকেলটা যেন ক্লান্তিতে স্থির হয়ে আছে। পাশার মনে হলো, অনন্তকাল পরে মলিন হতে শুরু করল পোর্টহোলের আলো। গতি একেবারেই কমে গেছে গ্রিফিথের, হামাগুড়ি দিয়ে যেন এগোচ্ছে। মিনিটখানেক পর পায়ের শব্দ কাছে আসতে শুনল ও। দরজায় চাবি ঢোকানোর শব্দ হলো।

সেই দুজন বডিগার্ড, প্রথম থেকেই যাদের নিয়ে আসে ফার্নান্দো। একজনের হাতে পাশার বেরেটা পিস্তলটা এখনও আছে। ওর দিকে পিস্তল তাক করে ধমকে উঠল লোকটা, 'এই, ওঠো। এখানে আরামে থাকা-খাওয়ার বিল মেটাতে যেতে হবে এখন তোমাকে।'

সাত

প্রায় কুচকাওয়াজ করিয়ে জাহাজের পিছনে নিয়ে চলল ওরা পাশাকে। একজন আগে রয়েছে, একজন পিছনে। অনেকগুলো প্যাসেজওয়ে পেরোতে হবে। রাস্তা চিনে রাখার চেষ্টা করছে পাশা। যদিও তাতে কোন লাভ হবে কি না জানে না।

মাঝে মাঝেই অন্য নাবিকদের পাশ কাটাচ্ছে ওরা। এমনভাবে পাশার দিকে তাকাচ্ছে, যেন ও একটা বিষাক্ত সাপ, পিষে মারতে পারলে খুশি হয়।

জাহাজের পেটের গভীরে একটা কম্প্যানিয়নওয়েতে এসে পড়ল ওরা। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার সময় ফাঁপা শব্দ হতে লাগল।

ওরা তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই সিঁড়িতে। আলো কম। চারদিকে ছয়ের ছড়াছড়ি। এরচেয়ে ভাল সুযোগ আর পাবে না

পাশা।

আরেকটা ল্যাণ্ডিঙের দিকে এগোনোর সময় সামনের লোকটা রেইলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে নিচে তাকাল। চট করে পিছনে তাকিয়ে পাশা দেখল, বেরেটাধারী দ্বিতীয় লোকটা গাল চুলকাচ্ছে আর হাই তুলছে। বন্দির দিকে প্রতিটি মুহূর্ত কঠোর নজর রাখতে শেখানো হয়নি ওদের। জাতে ওরা চোরাচালানি, পেশাদার খুনী কিংবা মারদাঙ্গাকারী নয়।

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন পাশার শরীরে। ঝট করে ডান পা'টা সামনে বাড়িয়ে ওর দুই ধাপ নিচে দাঁড়ানো লোকটার কিডনির কাছে লাথি মারল, ফেলে দিল রেইলের ওপর। পরক্ষণে ঘুরে গেল পিছনের লোকটার দিকে। বাঁ হাতে থাবা মেরে ওর মাথার দিক থেকে সরিয়ে দিল পিস্তলের নলটা।

ডিগবাজি খেয়ে নিচে পড়তে পড়তে হাত বাড়িয়ে থাবা দিয়ে রেইল ধরে ফেলল পিঠে লাথি খাওয়া লোকটা। পিস্তলটা ছেড়ে দিয়েছে হাত থেকে। শূন্যে ঝুলছে দুই পা। নিজেকে টেনে তুলে আবার এপাশে আসার চেষ্টা করছে।

চোখের পলকে পাক খেয়ে দ্বিতীয় লোকটার পিছনে চলে এল পাশা। একই সময়ে হাত ঝাঁকি দিয়ে বের করে আনল তারটা। গ্যারটের এক মাথা হাতের তালুতে পড়তেই মুহূর্তে টান দিয়ে পুরোটা বের করে ফেলল।

ঘুরতে আরম্ভ করেছে বেরেটাধারী নাবিক। তারটা ওর মাথার ওপর দিয়ে নীচে নামিয়ে গলায় পেঁচাল পাশা।

দম আটকে গেল লোকটার। চামড়ায় বসে গেছে তার। বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করছে ও। এক হাতে গলায় খামচাতে লাগল তারটা

ধরার জন্য, কিন্তু কোনমতেই তারে আঙুল বসাতে পারল না। আর কোন উপায় না দেখে পিস্তলটা পিছন দিকে তাক করার চেষ্টা করল।

ওর পিঠে এক হাঁটু চেপে ধরল পাশা। লোকটাকে চেপে ধরল রেইলের সঙ্গে। তারে টান বাড়িয়ে দিয়েছে যতটা সম্ভব। ফুলে উঠেছে হাতের পেশি। চামড়ায় কেটে বসে গেছে গ্যারট। উন্মত্তের মত তারটা খোলার চেষ্টা করছে লোকটা।

পায়ের কাছে খসে পড়ল পিস্তলটা।

রেইল ডিঙিয়ে এপাশে প্রায় চলে এসেছে প্রথম লোকটা। ল্যাণ্ডিঙে পা রেখে পিস্তলটার দিকে এগোল। হাঁপাতে হাঁপাতে পাশাকে বলল, 'তুমি গেছ!'

গ্যারটের কাজ শেষ। লাশটা ছেড়ে দিয়ে নিচু হয়ে বেরেটাটা তুলে নিয়েই লাফ দিল পাশা। ল্যাণ্ডিং থেকে পিস্তলটা তুলে সোজা হতে আরম্ভ করেছে প্রথম লোকটা।

বেরেটার নল লোকটার পাঁজরে ঠেসে ধরল পাশা, যাতে শব্দ চাপা পড়ে। ট্রিগার টিপে দিল, পর পর দুবার। পড়ে গেল লোকটা। হাঁ করে দম নেয়ার চেষ্টা করছে। ঠোঁটের কোণ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। ঝুঁকে বসে কান পাতল পাশা। জাহাজের ইঞ্জিনের ভারী একটানা শব্দ ছাড়া আর কিছুই কানে আসছে না। শোল্ডার রিগে বেরেটাটা ঢুকিয়ে রেখে সিঁড়ি থেকে দ্বিতীয় পিস্তলটা তুলে নিল ও। একটা ৯ এমএম টোরাস। বেল্টের নিচে গুঁজে রেখে লাশ দুটোকে টেনে নিয়ে এল ল্যাণ্ডিঙের দেয়ালের গোড়ায়, অন্ধকার ছায়ার কাছে। আশা করল, ও জাহাজ থেকে নেমে যাবার আগে ও দুটো কারও চোখে পড়বে না।

কিন্তু নামবে কী করে সেটা এক বিরাট প্রশ্ন। সবচেয়ে ভাল হয়, ওপরে উঠে একটা দড়ি খুঁজে বের করে সেটা ঝুলিয়ে জাহাজের পাশ বেয়ে পানিতে নেমে যাওয়া–নাবিকরা ওর নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা টের পাওয়ার আগেই; টের পেলে শিকারী কুকুরের মত ওকে ধরতে ছুটে আসবে ওরা।

জাহাজের পিছন দিকে দড়ি থাকার সম্ভাবনা আছে।

কম্প্যানিয়ন পেরিয়ে এসে পিছনে ছুটল ও। রাস্তার একটা সংযোগস্থলের কাছে এসে দাঁড়াল। বাঁয়ে মৃদু পায়ের শব্দ শোনা গেল। সুতরাং ডানে চলল ও। বিশ কদম এগোতেই ঝাঁকি দিয়ে পিছনে চলতে শুরু করল গ্রিফিথের ইঞ্জিন। অনেক পিছন থেকে একটা ঘষার শব্দ ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত জাহাজে। গিয়ার ঠিকমত দাঁতে দাঁতে না পড়লে যেমন হয়, শব্দটা অনেকটা সেরকম; হয়তো মরচে পড়া মস্ত কোনও দরজা জোর করে টেনে খোলা হচ্ছে। চিৎকারের শব্দও কানে এল পাশার।

ফার্নান্দো বলেছে, সূর্য ডোবার পর সাবমেরিনের সঙ্গে দেখা হবে জাহাজটার। হয়তো জাহাজ ও সাবমেরিনের গা ঘেঁষাঘেঁষিতেই শব্দটা হয়েছে।

রাস্তার পরের সংযোগস্থলটায় এসে বাঁ দিকে ঘুরল পাশা। শব্দ লক্ষ্য করে এগোচ্ছে। কীভাবে মাল পাচার করে দেখার লোভ সামলাতে পারছে না। প্রচণ্ড ঝুঁকি নিচ্ছে ও। জানে, ওদিকে গেলে নাবিকদের চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু ঝুঁকি নিয়েও কীভাবে কী করছে ওরা জানার কৌতূহলে সেদিকে এগোচ্ছে।

সিঁড়িতে দুজন নাবিককে কাবু করার পর আর কারও মুখোমুখি হতে হয়নি ওকে। পাশা অনুমান করল, ডেকে ব্যস্ত রয়েছে কিছু

লোক, জাহাজের বাকি সবাই চলে গেছে সাবমেরিনটাকে সহায়তা করতে। একটা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল ও। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে পাল্লাটা। ঠেলা দিতেই খুলে গেল। আর খুলেই স্থির হয়ে গেল ও। নিজেকে সাঁটিয়ে ফেলল বাল্কহেডের সঙ্গে।

মালে ঠাসাঠাসি মস্ত একটা হোল্ডে ঢুকেছে ও। একটা ফোর্কলিফটের চারপাশে বাক্স সাজিয়ে রাখতে ব্যস্ত কয়েকজন নাবিক। এখনও ওকে দেখেনি কেউ।

ওদের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে একটা ক্যাটওঅক ধরে এগোল পাশা। জাহাজের একপাশে, আরেকটা দরজার কাছে চলে এল। সাবধানে পাল্লা খুলে অন্যপাশে বেরোল। এটাও আরেকটা হোল্ড, তবে প্রথমটার চেয়ে ছোট, আর এর অর্ধেকটাতে মাল বোঝাই। কী করবে ভাবছে ও, এ সময় হোল্ডের নিচে সামনের দিকের একটা দরজা দিয়ে ঢুকল একজন নাবিক।

উবু হয়ে বসে তাকিয়ে রইল পাশা। সামনের বাল্কহেডের দিকে এগিয়ে গেল নাবিক, যেখানে রয়েছে আরেকটা ক্যাটওঅকে ওঠার জন্য ধাতব আঙটার সিঁড়ি। কিন্তু সিঁড়িতে না উঠে একটা প্যাসেজওয়ে দিয়ে চলে গেল লোকটা।

নিচের দরজাটার দিকে তাকিয়ে আছে পাশা, যেটা দিয়ে ঢুকেছিল নাবিক। এমনভাবে ক্যামোফ্ল্যাজ করা, লোকটাকে বেরোতে না দেখলে দরজাটা যে ওখানে রয়েছে বুঝতেই পারত না ও। অন্যপাশে কী আছে দেখার কথা ভাবল।

নিচে নামার জন্য আংটা রয়েছে। সেগুলো বেয়ে দ্রুত নেমে এল পাশা। মাথা নুইয়ে, মালপত্রের আড়ালে আড়ালে দরজাটার কাছে চলে এল। দেয়ালের জোড়ার কাছে চমৎকারভাবে মিলিয়ে দিয়ে

লুকিয়ে রাখা হয়েছে একটা হুড়কো। টান দিতেই নিঃশব্দে খুলে গেল। আস্তে করে পাল্লা ফাঁক করে সেখান দিয়ে অন্যপাশে তাকাল ও।

ফেলিডাই লোকটা বুদ্ধিমান।

জাহাজটাকে নতুন করে সাজানোর কথা জানিয়েছে ফার্নান্দো। কিন্তু কতটা সাজিয়েছে, অনুমান করতে পারেনি তখন পাশা। ধাতব দেয়াল তুলে হোল্ডটাকে দু'ভাগ করা হয়েছে। বড় অংশটা আগের মতই মালপত্র রাখার কাজে ব্যবহার হচ্ছে, আর ছোট অংশটা তৈরি করা হয়েছে একটা মিনি-সাব লুকিয়ে রাখার গুপ্তকক্ষ হিসেবে।

কীভাবে কী ঘটে বোঝা যাচ্ছে এটা দেখে। কলাম্বিয়ায় সাবমেরিনে কোকেইন বোঝাই করে জাহাজে তোলা হয়। তারপর উত্তরে মেকসিকো উপসাগরের দিকে এগিয়ে যায় জাহাজটা, কী-এর পশ্চিমে নির্দিষ্ট কোনও জায়গায়। অল্প সময়ের জন্য ওখানে থামে গ্রিফিথ, সাবমেরিনটাকে নামিয়ে দেয়ার জন্য। তারপর নিজের পথে চলে যায়, কারও সন্দেহ না জাগিয়ে।

একটা নিখুঁত ব্যবস্থা। নির্দিষ্ট বন্দরে পৌঁছে মালবাহী জাহাজটা যখন এটার বৈধ মাল খালাস করে, মিনি-সাবটা তখন ওটার অবৈধ মাল খালাস করে ডোমিনিক আইল্যাণ্ডে—অন্তত কয়েক রাত আগে পর্যন্ত তা-ই করত। এব্রো ডুয়েরো সেগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে মেইনল্যাণ্ডে ছড়িয়ে দিত।

পশ্চিম উপকূলেও নিশ্চয় এ ধরনেরই কোনও ব্যবস্থা রয়েছে।

এ সময় হালের পাশের পানিতে ভাসল মিনি-সাবটা। ছয়জন নাবিক ক্রেন থেকে ঝোলানো শিকলের হুকে ওটাকে আটকাতে

ব্যস্ত হলো। আরও চারজন নাবিক বিভিন্ন কাজ করছে। তদারক করছে ফার্নান্দো, পাশার কয়েক গজ দূরে এদিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও। পুরো জায়গাটা উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত।

ক্যাপ্টেনের মনোযোগ এখন অন্যদিকে, এই সুযোগে ওপরের ডেক দিয়ে দড়ি বেয়ে নেমে যেতে পারবে ও।

পাল্লাটা লাগিয়ে দিচ্ছে পাশা, হঠাৎ পিছনে কথা বলে উঠল একটা কণ্ঠ, 'এই, কে তুমি? এখানে কী করছ?'

কয়েক মিনিট আগে এই দরজা দিয়ে যে লোকটাকে বেরোতে দেখেছিল পাশা, ফিরে তাকিয়ে দেখল, সেই লোকটা। ফিরে এসেছে। হাতে একটা বড় রেঞ্চ। পাশা পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই বাড়ি মারার জন্য রেঞ্চ তুলল লোকটা। পরক্ষণে তলপেটে পাশার হাতের প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে কুঁকড়ে গেল। আরেক ঘুসিতে চিত।

কিন্তু চিত হওয়ার আগেই চেঁচামেচি করে ক্ষতি যা করার করে দিয়েছে। হট্টগোল শোনা গেল অন্যপাশে। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজাটা। ফার্নান্দো দাঁড়িয়ে আছে। পাশাকে দেখে নাবিকদের উদ্দেশ্যে গর্জে উঠল, 'অ্যাই, এখানে এসো তোমরা! ফেড হারামজাদা বেরিয়ে চলে এসেছে!' পি-জ্যাকেটের নিচ থেকে ছুরি বের করল।

দৌড়ানোর চেষ্টা করল না পাশা। আংটা বেয়ে উঠতে যাওয়াটা হবে মারাত্মক বোকামি। নিচ থেকে পিস্তলের সহজ নিশানা হয়ে যাবে। আর যদি ওদিক দিয়ে পালাতে পারেও পাশা, ফার্নান্দো সাবধান করে দিলে নাবিকরা খুঁজে বের করবে ওকে।

উল্টোটা করল পাশা। দরজার দিকে ছুটল ও। ছুরি দিয়ে খোঁচা মারার জন্য তৈরি হলো ফার্নান্দো। লক্ষ করল না, পিস্তল বের

করেছে পাশা। ৯ এম এম বেরেটার একটি মাত্র গুলি খরচ করল ও। গোল একটা লাল ফুটো দেখা দিল ফার্নান্দোর কপালে। পিছিয়ে গিয়ে উল্টে পড়ল এগিয়ে আসা দুজন নাবিকের ওপর, ওকে সাহায্য করতে এগোল ওরা।

দৌড়ে সাব-কম্পার্টমেন্টে ঢুকে পড়ল পাশা। সমস্ত কাজ থেমে গেছে। বরফের মত জমে গেছে যেন কয়েকজন, বাকিরা ছুরি-পিস্তল বের করে ওর ওপর হামলা চালাতে আসছে।

বেল্টে গোঁজা টরাস পিস্তলটা টেনে বের করল পাশা। দুই হাতে দুটো পিস্তল নিয়ে দৌড় দিল জাহাজের খোলের খোলা মস্ত ফোকরটার দিকে, যেটা দিয়ে সাবমেরিনটাকে ঢোকানো হয়। বাঁধা দিতে এল একজন লোক। নির্দ্বিধায় ওর বুকে গুলি করল পাশা। সাবমেরিনের ছাতে দাঁড়ানো আরেকজন রিভলভার তুলল ওকে লক্ষ্য করে। টরাসের একটা বুলেট প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে পানিতে ফেলল ওকে।

ফোকরটার কিনারে পৌঁছে গেল পাশা। সামনে বিস্তারিত উপসাগরের পানি। ঝাঁপ দিল ও। পানিতে পড়ার আগে গুলির শব্দ শুনল। তবে ওর কোন ক্ষতি করল না বুলেট। ওপর দিয়ে চলে গেছে। পানিতে পড়ল ও। চারপাশে বুলেট-বৃষ্টি হচ্ছে। সেগুলো এড়াতে মাথার ওপর হাত দুটো লম্বা করে দিয়ে পা ছুঁড়ে যতটা সম্ভব নিচে নেমে চলল ও।

কিছুদূর কোণাকুণি নেমে, সোজা হয়ে জাহাজকে পাশে রেখে সাঁতরে চলল পিছন দিকে। জাহাজের মস্ত প্রপেলার দুটো চোখে পড়ল। বাতাসের জন্য আকুলিবিকুলি করছে ফুসফুস। দম না নিয়ে আর পারবে না পাশা। ভাসতে হবে।

পানির ওপর মাথা তোলার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বিপদ দেখল। ফ্লাডলাইটের আলো পড়ল ওর ওপর। সঙ্গে সঙ্গে গুলি শুরু হলো। কোয়ার্টার ডেকে দাঁড়িয়ে গুলি করছে লোকটা। ওর মাথা আর কাঁধের খানিকটা শুধু চোখে পড়ছে পাশার। দ্রুত সাঁতরে সরে যেতে শুরু করল ও। কাঁচা লোক গুলি বর্ষণকারী, পানিতে সচল নিশানাকে লাগানোর দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা কোনটাই নেই ওর, তাই প্রাণে বাঁচল পাশা।

ম্যাগাজিন খালি না হওয়া পর্যন্ত গুলি চালিয়ে গেল লোকটা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আরেকটা নতুন ম্যাগাজিন ভরবে।

পাশার ওপর খাড়া হয়ে আছে জাহাজের খোল। ঢালু হয়ে উঠেছে। গুলি করতে হলে যাতে সামনে ঝুঁকে আসতে হয় গুলিবর্ষণকারীর, সেজন্য খোলের গায়ে প্রায় লেগে থেকে দ্রুত জাহাজের পেটের দিকে সাঁতরে চলল পাশা। বুঝতে পারছে, বেঁচে যাওয়াটা সাময়িক। শীঘ্রি আরও পিস্তলধারী এসে যোগ দেবে লোকটার সঙ্গে। একজনের হাত ফসকালেও সবার ফসকাবে না।

খোলের গায়ে সেঁটে থেকে, মাথা উঁচু করে তাকাল ও। পুবদিকে, দূরে, একটা দ্বীপ চোখে পড়ল বলে মনে হলো। কিন্তু ওকে বলা হয়েছে, কী থেকে দূরে মাল খালাস করা হয়, কোস্ট গার্ড আর পুলিশের চোখ থেকে দূরে। তারমানে উপসাগরের মাঝখানে রয়েছে এখন ওরা।

জাহাজের ডানপাশে প্রচুর শব্দ আর পানিতে আলোড়ন বুঝিয়ে দিল সাবমেরিনটাকে টেনে তোলা হচ্ছে। শীঘ্রি রওনা হয়ে যাবে গ্রিফিথ। হয়তো–ভাবল পাশা–ওকে ধরার চেষ্টাও চলতে পারে। তার আগেই জাহাজের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারলে ভাল

হয়।

পুবে সাঁতরে চলল পাশা। নিজের অজান্তেই শক্ত হয়ে গেছে পিঠের চামড়া, যে কোন মুহূর্তে বুলেটের স্পর্শ পাবার আশঙ্কায়। সরাসরি ওর গায়ে ফ্লাডলাইটের আলো পড়ছে। একসঙ্গে গুলি বর্ষণ শুরু হলো চার-পাঁচটা পিস্তল থেকে। আশেপাশে বুলেট পড়ছে। দু'একবার মুখের কাছে পানি ছিটকে উঠল বুলেটের ঘায়ে।

ভেসে থাকলে গুলি খাবে, জানা কথা। সব গুলিই মিস হবে না ওদের। আবার ডুব দিল ও। এক ডুবে চলে এল যতটা সম্ভব দূরে। বাতাসের জন্য ফুসফুসটা যখন আর্তনাদ শুরু করল, তখন ভেসে উঠে তাড়াতাড়ি শ্বাস নিয়ে আবার ডুব। এভাবে ডুবে, ভেসে, এগিয়ে চলল। যখনই মাথা তোলে, সঙ্গে সঙ্গে গুলি বর্ষণ শুরু হয়। তবে ক্রমেই সরে যাচ্ছে পাশা, তা ছাড়া মাথা তুলে দম নেয়ার সময় স্থির থাকে না ও, সেটা একটা কারণ হলেই নেহায়েত ভাগ্যক্রমেই বেঁচে যাচ্ছে ও।

আরেকবার মাথা তুলে অদ্ভুত একটা ঘ্যাঁস-ঘ্যাঁসে শব্দ কানে এল পাশার। এখন আর গুলি হচ্ছে না, তাই কীসের শব্দ হচ্ছে দেখার জন্য পিছন ফিরে তাকানোর ঝুঁকি নিল।

ক্রেনের সাহায্যে একটা লাইফবোট নামানো হচ্ছে। সেটা ভর্তি সশস্ত্র নাবিক। কয়েক ফুট নেমে নেমে ঝাঁকি দিয়ে থেমে যাচ্ছে। আবার নামছে। ক্রেনের কন্ট্রোল থেকে নিশ্চয় বোটটাকে দেখতে পাচ্ছে না ক্রেনম্যান।

যা-ই হোক, প্রাণ বাঁচানোর প্রচণ্ড তাগিদে মরিয়া হয়ে সাঁতরে চলল পাশা। ডেকে দাঁড়ানো নাবিকেরা চিৎকার-চেঁচামেচি করছে, ওকে উদ্দেশ্য করে গালি দিচ্ছে। চূড়ান্ত মজা দেখার অপেক্ষা করছে

ওরা।

পেশিতে খিঁচ ধরতে আরম্ভ করেছে পাশার। কিন্তু ব্যথার কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাইল না ও। সাঁতরে চলল। তবে গতি কমে গেছে। ইতিমধ্যে দুবার ফিরে তাকিয়েছে। শেষবার দেখেছে, পানিতে নামানো হয়ে গেছে লাইফবোটটা। গলুইয়ে বসানো একটা স্পটলাইট। দাঁড় বাইতে শুরু করেছে নাবিকরা।

উল্লসিত চিৎকার শোনা গেল জাহাজের ডেক থেকে, বোট আর পাশার মাঝে দূরত্ব কমে যেতে দেখে, চেঁচাচ্ছে লোকগুলো। দুজন রাইফেলধারী নাবিক বোটের গলুইয়ে এসে দাঁড়াল। দুজনের মধ্যে একজন ফার্নান্দো রাইফেলের বাঁট কাঁধে ঠেকাল।

বাঁয়ে ঘুরে গেল পাশা। ওর কাঁধের কয়েক ইঞ্চি দূরে চড় মারার মত শব্দ তুলে পানিতে পড়ল একটা বুলেট, রাইফেলের গুলির শব্দ উপসাগরের পানির ওপর দিয়ে যেন গড়িয়ে চলে গেল। ডানে সরল ও, তারপর বাঁয়ে, তারপর আবার ডানে। এঁকেবেঁকে চলাতে দ্বিতীয় গুলিটাও মিস হলো।

চেঁচিয়ে, শিস দিয়ে, ফার্নান্দোকে উৎসাহিত করছে দর্শকরা।

কোনদিকে না তাকিয়ে সাঁতরে চলেছে পাশা। এক কনুইয়ের কাছে পানিতে খামচি দিল যেন শক্তিশালী অস্ত্র থেকে ছোঁড়া বুলেট। পিছু ধাওয়াকারীদের সঙ্গে পেরে ওঠা অসম্ভব। হঠাৎ থেমে গিয়ে, ওয়ালথারটা বের করল ও। এলোমেলো ঢেউয়ে ভেসে থেকে নিশানা করা কঠিন। তবু যতটা সম্ভব লক্ষ্যস্থির করে টিপে দিল ট্রিগার।

ঝাঁকি দিয়ে পিছনে বাঁকা হয়ে গেল ফার্নান্দোর দেহটা। পড়ে গেল বোটের পাটাতনে।

পাল্টা আক্রমণ দেখে খেপে গেল নাবিকেরা। নতুন উদ্যমে উঠতে-পড়তে শুরু করল দাঁড়গুলো। পাশার ষাট ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছে বোটটা। দ্রুত এগিয়ে আসছে। দ্বিতীয় লোকটাকে রাইফেল তুলতে দেখল পাশা। তাড়াহুড়ো করছে না লোকটা, ঠাণ্ডা মাথায় নিশানা করছে।

ঠিক এ সময়, পাশার জীবন যখন সরু একটা সুতোয় ঝুলছে, পশ্চিম থেকে মালবাহী জাহাজটার ঠিক ওপর দিয়ে উড়ে এল একটা সি-প্লেন। সামান্য কাত হয়ে গেল প্যাসেঞ্জার সিটের পাশের ডানা। গর্জে উঠল একটা এম-৬০ অটোম্যাটিক গান। তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকারের মত শব্দ তুলে যেন খেয়ে ফেলতে শুরু করল লাইফবোট আর ওটার যাত্রীদের। প্রথমে ঝাঁকি খেয়ে পানিতে পড়ল রাইফেলধারী, ঝাঁঝরা হয়ে গেছে শরীর। আরও চারজন নাবিকের একই দশা হলো। তারপর ভেঙে পড়ল অসংখ্য গুলি খাওয়া বোটটা, এতগুলো মানুষের ভারের চাপ আর সহ্য করতে না পেরে।

কাত হয়ে ঘুরল উভচর বিমানটা। নীচে নামতে নামতে পানি স্পর্শ করল। ল্যাণ্ড করল মসৃণভাবে। তীব্র গতিতে প্রপেলার দুটো ঘুরিয়ে ছুটে এল পাশার দিকে। ককপিট উইন্ডো আর গান ব্লিস্টার বেগুনি রঙ করা, তার ভিতর দিয়ে কন্ট্রোলে কে রয়েছে দেখা যাচ্ছে না।

জাহাজের ডেক থেকে রাগত কোলাহল শোনা যাচ্ছে। প্লেনটাকে লক্ষ্য করে ছুটে এল উত্তপ্ত সীসা, কিন্তু বেশিরভাগই দূরে পড়ল। কয়েকটা গুলি ডানা আর ফিউজিলাজে লেগে শিস কেটে পিছলে চলে গেল, কোন ক্ষতি না করে।

প্লেনের কাছে সাঁতরে এল পাশা। জাহাজের দিকে পাশ ফিরে থেকে ওকে আড়াল করেছে প্লেনের বডি। একটা দরজা খুলে গেল, ছুঁড়ে দেয়া হলো দড়ির সিঁড়ি, ঢেউয়ের মধ্যে ঝুলে থেকে পানিতে চুমু খাচ্ছে যেন নিচের অংশটা। হাত বাড়িয়ে ওটা ধরে ফেলে বেয়ে উঠতে শুরু করল পাশা। ওপর থেকে শোনা যাচ্ছে চাপা কথাবার্তার শব্দ। একজনের কণ্ঠ অন্যজনের চেয়ে জোরাল, পাশাকে বলল, 'তাড়াতাড়ি করো, জলদি ওঠো!' কণ্ঠটা চিনতে পারল পাশা। সিঁড়ির মাথায় উঠে আসতে চোখ পড়ল জ্যাক গ্রিমালদির হাসিমুখের দিকে। হান্টারের ডিপার্টমেন্টের লোক ও, পাইলট।'

'কেমন আছো, পাশা? আগুন থেকে তুলে নিতে এলাম তোমাকে।'

'থ্যাংক ইউ, জ্যাক। মনে হচ্ছে, নতুন জন্ম হয়েছে আমার!' সিটে নেতিয়ে পড়ল পাশা।

কী-ওয়েস্টের দিকে উড়ে চলল প্লেন। পাশা ভাবছে, দক্ষিণ ফ্লোরিডার কাজ আপাতত শেষ। এখানকার চক্রটাকে অকেজো করে দেয়া হয়েছে। তবে সব শেষ হয়নি। ফেলিডাইকে খুঁজে বের করতে হবে এবার। সে-দায়িত্ব আপাতত হান্টারের ওপর ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজল ও।

- শেষ -